বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)

এম.ফিল থিসিস

GIFT

তত্ত্বাবধায়ক

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

428195

গবেষক

মোছাঃ উম্মে তাসলিমা
প্রভাষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ
সিরাজগঞ্জ

Dhaka University Library
428195

অক্টোবর, ২০০৭

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ফোন : ৮৮০-২-৯৬৬১৯২০-৭৩/৬১৯০, ৬১৯১
Phone : 880-2-9661920-73/6190, 6191
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
Fax : 880-2-8615583
E-mail : history@univdhaka.edu

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
Department of History, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোছাঃ উম্মে তাসলিমা আমার তত্ত্বাবধানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য "বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করেছেন।

এ অভিসন্দর্ভ তিনি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোনো প্রকার ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন)
সহযোগী অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

428195

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি অঙ্গীকার করছি যে, "বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)" শিরোনামের এ অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব রচনা। আমার জানামতে ইতোপূর্বে অন্য কোন গবেষক বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ শিরোনামায় কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদন করেননি। এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য লিখিত। এর পূর্বে এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা কোন প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা লাভের জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

মোছাঃ উম্মে তাসলিমা

(মোছাঃ উম্মে তাসলিমা)
এম.ফিল গবেষক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
প্রভাষক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি
সরকারি রাশিদাজ্জোহা মহিলা কলেজ
সিরাজগঞ্জ

428195

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক (১৯৭১-১৯৯০)" শীর্ষক বিষয়ে আমি ২০০০-২০০১ শিক্ষাবর্ষে ইতিহাস বিভাগে এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হই। যথাসময়ে প্রথম পর্বের কোর্স সম্পন্ন করলেও বিভিন্ন কারণে গবেষণাকর্মটি শেষ করতে দেরি হয়। দেরিতে হলেও অবশেষে আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও বিভাগীয় বিভিন্ন শিক্ষকের সহযোগিতায় গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। আমি তাঁদের কাছে এ ব্যাপারে ঋণী। প্রথমেই আমার শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এম.ফিল কোর্সে ভর্তির প্রাথমিক অবস্থা থেকে অর্থাৎ বিষয় নির্বাচন থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ শেষ করা পর্যন্ত তাঁর যাবতীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা আমার গবেষণায় সহায়ক হয়েছে। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। ইতিহাস বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক মণ্ডলী বিশেষ করে ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন, ড. আহমেদ কামাল, ড. সোনিয়া নিশাত আমিন, ড. নুরুল হুদা আবুল মনসুর, ড. সুরমা জাকারিয়া চৌধুরী ও ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান-এর নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁরা গবেষণার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভের বিন্যাস, অধ্যায় বিশ্লেষণ ইত্যাদি ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। এছাড়া আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শিক্ষক মোঃ হাবিবউল্লাহ্ বাহার এর নিকট যিনি উক্ত কোর্সে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে আমার কাজটি সমাপ্ত করতে সহযোগিতা করেছেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে আমাকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস, পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (BIISS), বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমি (সাভার) গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জাতীয় যাদুঘর লাইব্রেরি প্রভৃতি থেকে আমি তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও ইআরডি গ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ল এণ্ড ইন্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (BILIA), গণ উন্নয়ন গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

(ধানমণ্ডি) থেকেও কিছু তথ্য-উপাত্ত সংগৃহীত হয়েছে। এসব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে জাতীয় গ্রন্থাগার ও আর্কাইভস-এর তৎকালীন পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর শরীফ উদ্দিন আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-গ্রন্থাগারিক ময়েজ উদ্দীন খান-এর কথা স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গ্রন্থাগারিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী গবেষক মুর্শিদা বিনতে রহমানের কাছে যিনি আমাকে ওয়েব সাইটের বিভিন্ন তথ্য ও মানচিত্র সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আফগানিস্তান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনকারী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ ফজলুর রহিম ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী আব্দুল করিমের কাছে যাঁরা আমাকে মূল্যবান সাক্ষাৎকার প্রদান করে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করেছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই মোঃ রফিকুল ইসলামের কাছে যিনি অত্যন্ত সাবধানতার সাথে আমার অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করেছেন।

আমার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ি আমাকে গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন; তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে আমার স্বামী মোঃ মিজানুর রহমানের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি গবেষণার দীর্ঘ সময় নৈতিক সমর্থন, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন এবং বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে আমার পরিশ্রমকে সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন।

মোছাঃ উম্মে তাসলিমা

Dhaka University Institutional Repository

দেশ পরিচিতি

বাংলাদেশ: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দেশের নাম	:	বাংলাদেশ
সরকারি নাম	:	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার পদ্ধতি	:	মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সংসদীয় সরকার
রাজধানী	:	ঢাকা
সীমানা	:	পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর
ভূ-সীমা	:	৪২৪৬ কিলোমিটার (মায়ানমারের সাথে ১৯৩ কিলোমিটার এবং ভারতের সাথে ৪০৫৩ কিলোমিটার)
আয়তন	:	১,৪৪,০০০ বর্গকিলোমিটার (স্থলভাগ ১,৩৩,৯১০ বর্গকিলোমিটার ও জলভাগ ১০,০৯০ বর্গকিলোমিটার
ভৌগোলিক অবস্থান	:	২০°৩৪′ ও ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ ও ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত
জলবায়ু	:	নাতিশীতোষ্ণ
জনসংখ্যা	:	১৫,৪৪,০৮,৩৩৯ জন (জুলাই, ২০০৭ অনুযায়ী)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	২.০৫৬% (২০০৭ অনুযায়ী)
জনসংখ্যার ঘনত্ব	:	৮৪৬ জন (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
জন্মহার	:	২৯.৩৬ (প্রতি হাজারে, ২০০৭ অনুযায়ী)
মৃত্যুহার	:	৮.১৩ (প্রতি হাজারে, ২০০৭ অনুযায়ী)
নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী	:	বাঙালি ৯৮% ও অন্যান্য ২%
ভাষা	:	বাংলা (মাতৃভাষা), দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি
স্বাক্ষরতার হার	:	৪৩% (১৫+)
ধর্ম	:	ইসলাম (মুসলমান ৮৩%, হিন্দু ১৬% ও অন্যান্য ১%, ১৯৯৮ অনুযায়ী)
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশী
স্বাধীনতা অর্জন	:	১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (পাকিস্তানের নিকট হতে)
রাষ্ট্রীয় দিবস	:	স্বাধীনতা দিবস ২৬ মার্চ, বিজয় দিবস ১৬ ডিসেম্বর ও শহীদ দিবস (আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস) ২১ ফেব্রুয়ারি
বার্ষিক জিডিপি	:	৩৩৬.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (২০০৬ অনুযায়ী)
মাথাপিছু আয়	:	২৩০০ মার্কিন ডলার (২০০৬ অনুযায়ী)
মুদ্রা	:	টাকা (১ ডলার = ৬৯.০৩১ টাকা, ২০০৬ অনুযায়ী)
প্রশাসনিক বিভাগ	:	৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট)
মোট জেলা	:	৬৪টি

Source: The World Factbook- Bangladesh.htm

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্রঃ বাংলাদেশ

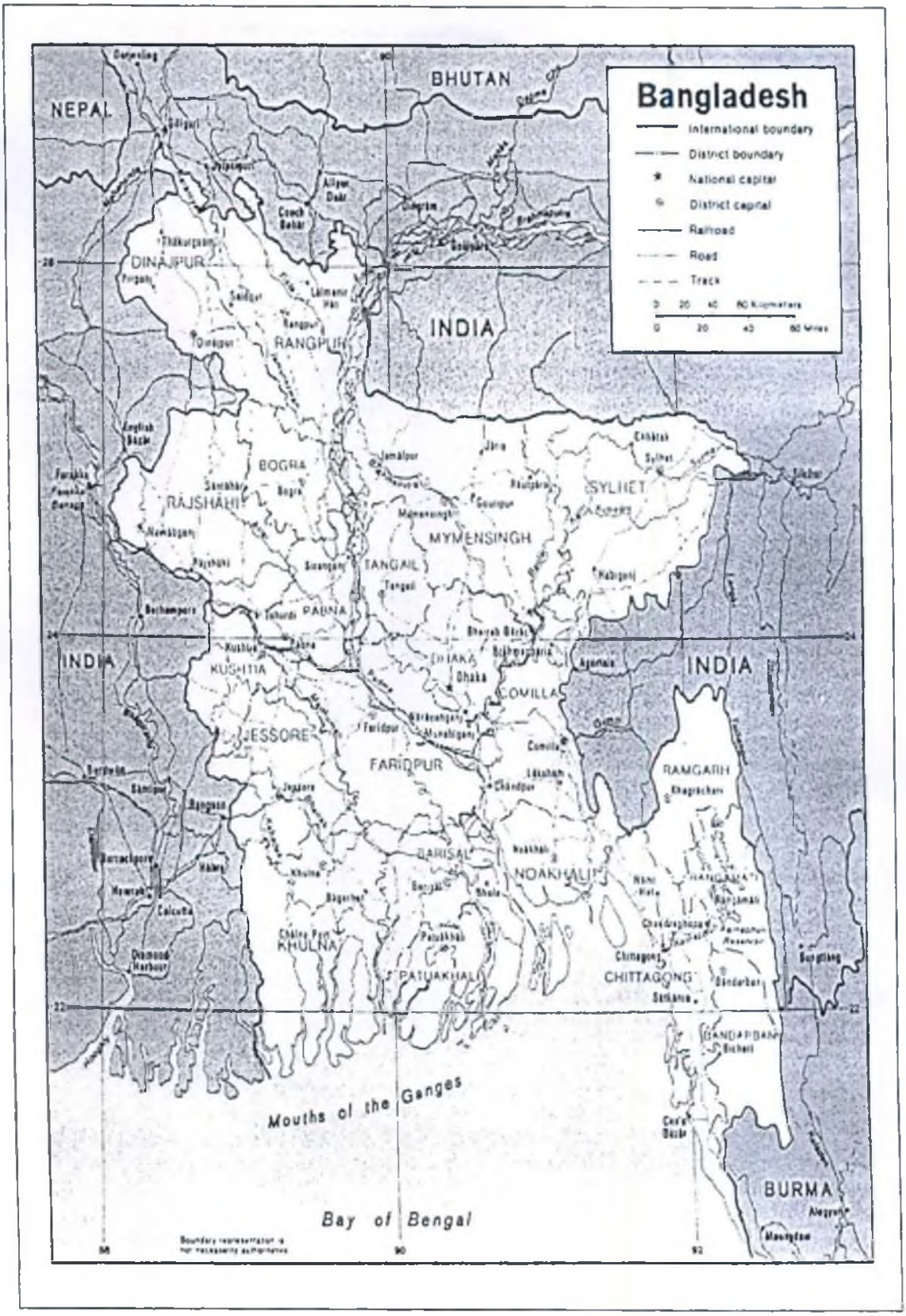

Source: The World Factbook- Map of Bangladesh.htm

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তান: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

দেশের নাম	:	আফগানিস্তান
সরকারি নাম	:	ইসলামি প্রজাতন্ত্রী আফগানিস্তান
রাজধানী	:	কাবুল
সীমানা	:	দক্ষিণ ও পূর্বে পাকিস্তান, পশ্চিমে তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, উত্তরে তাজিকিস্তান এবং দূরপ্রাচ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন
ভূ-সীমা	:	৫,৫২৯ কিলোমিটার (চীনের সাথে ৭৬ কিলোমিটার, ইরানের সাথে ৯৩৬ কিলোমিটার, পাকিস্তানের সাথে ২,৪৩০ কিলোমিটার, তাজিকিস্তানের সাথে ১২০৬ কিলোমিটার, তুর্কমেনিস্তানের সাথে ৭৪৪ কিলোমিটার এবং উজবেকিস্তারে সাথে ১৩৭ কিলোমিটার
আয়তন	:	৬,৪৭,৫০০ বর্গকিলোমিটার
ভৌগোলিক অবস্থান	:	২৯°৩০′ ও ৩৮°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৩০′ ও ৭৫°০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত
জলবায়ু	:	চরমভাবাপন্ন
জনসংখ্যা	:	৩,১৮,৮৯,৯২৩ জন (জুলাই, ২০০৭ অনুযায়ী)
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	:	২.৬২৫% (২০০৭ অনুযায়ী)
জনসংখ্যার ঘনত্ব	:	৪৬ জন (প্রতি বর্গকিলোমিটারে)
জন্মহার	:	৪৬.২১ (প্রতি হাজারে, ২০০৭ অনুযায়ী)
মৃত্যুহার	:	১৯.৯৬ (প্রতি হাজারে, ২০০৭ অনুযায়ী)
নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী	:	পাকতুন বা পাঠান ৪২%, তাজিক ২৭%, হাজারা ৯%, উজবেক ৯%, আইমাক ৪%, তুর্কোম্যান ৩%, বেলুচ ২% ও অন্যান্য ৪%
ভাষা	:	ফারসি বা দারি ৫০% এবং পশতু ৩৫%, তুর্কি ১১%, বেলুচ ও অন্যান্য ৪%
স্বাক্ষরতার হার	:	২৮.১% (১৫+)
ধর্ম	:	ইসলাম (সুন্নী ৮০%, শিয়া ১৯% ও অন্যান্য ১%
জাতীয়তা	:	আফগান
স্বাধীনতা অর্জন	:	১৯১৯ (যুক্তরাজ্যের নিকট হতে)
স্বাধীনতা দিবস	:	১৯ আগস্ট
বার্ষিক জিডিপি	:	৩২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
মাথাপিছু আয়	:	১৪৯০ মার্কিন ডলার
মুদ্রা	:	আফগানি
প্রশাসনিক বিভাগ	:	৩৪টি

Source: http//en.wikipedia.org/wiki/Afganistan,
http:// www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af/htm

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র: আফগানিস্তান

Source: http:// www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af/htm

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রত্যয়ন পত্র		i
অঙ্গীকার পত্র		ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার		iii
দেশ পরিচিতি		v
প্রথম অধ্যায়	: ভূমিকা	১
	সার সংক্ষেপ	১
	অধ্যায় বিভাজন	৫
	বিশ্লেষণের তত্ত্ব কাঠামো	১০
	নির্ধারকসমূহ	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	: বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : ঐতিহাসিক যোগসূত্র	১৮
	রাজনৈতিক যোগসূত্র	১৮
	সাংস্কৃতিক যোগসূত্র	৪১
তৃতীয় অধ্যায়	: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আফগানিস্তানের ভূমিকা	৫১
চতুর্থ অধ্যায়	: বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক : মুজিব আমল (১৯৭১-১৯৭৫)	৬২
	(ক) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : রাজনৈতিক সম্পর্ক	৬২
	(খ) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : অর্থনৈতিক সম্পর্ক	৮৩
পঞ্চম অধ্যায়	: বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক : জিয়া আমল (১৯৭৫-১৯৮১)	৮৮
	(ক) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : রাজনৈতিক সম্পর্ক	৮৮
	(খ) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : অর্থনৈতিক সম্পর্ক	১০২
ষষ্ঠ অধ্যায়	: বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক : এরশাদ আমল (১৯৮১-১৯৯০)	১০৬
	(ক) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : রাজনৈতিক সম্পর্ক	১০৬
	দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আফগান সমস্যা	১০৯
	আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপ: জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা	১১২
	আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপ: ওআইসিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভূমিকা	১১৯
	রাজনৈতিক দলের ভূমিকা	১২৪
	বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া	১২৬
	অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব	১২৭
সপ্তম অধ্যায়	: উপসংহার	১৩১
অষ্টম অধ্যায়	: পরিশিষ্ট	১৩৭
গ্রন্থপঞ্জি		১৬১

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

সার সংক্ষেপ

প্রাচীন সভ্যতা ও গৌরবময় ঐতিহ্যের লীলাভূমি আফগানিস্তান। প্রাচীনকালে আরিয়ানা, মধ্যযুগে খোরাসান এবং সমকালে আফগানিস্তান নামে পরিচিত এশিয়ার এ দেশটিতে সভ্যতার স্পন্দন জাগে সুদূর অতীতেই। মানব সভ্যতার বিভিন্ন সময়ের স্বাক্ষর আজও এখানে বর্তমান। গান্ধারা সভ্যতার স্মৃতি ও স্বাক্ষরবাহী নিদর্শনাদিও রয়েছে আফগানিস্তানে। স্বীয় সভ্যতা ও ঐতিহ্যের পাশাপাশি বিভিন্ন জাতির ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকর্ম, সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় এ আফগান ভূমিতে। আফগানিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা পশতু ও দারির পাশাপাশি প্রচলিত রয়েছে প্রতিবেশী ইরানের ভাষা ফারসি। প্রাচীন ভারতবর্ষ ও পারস্যে গ্রিক বিজেতা আলেকজাণ্ডারের অভিযান এ এলাকায় গ্রিক সভ্যতার যে প্রভাব রেখে গিয়েছিলো তার কিছু কিছু স্বাক্ষর পাওয়া যায় আফগানিস্তানের পরবর্তীকালের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে আফগানিস্তানের বুকে আবির্ভাব ঘটেছে বিভিন্ন ধর্মের। প্রাচীন যুগে আর্যধর্ম ও পরবর্তী পর্যায়ে বৌদ্ধধর্মের পর ইসলাম ধর্ম এ দেশটিতে সর্বাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

পার্বত্যভূমি, উপত্যকা, সর্পিল গিরিপথ আর বৈচিত্রময় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ আফগানিস্তান। প্রাকৃতিক বিপুল প্রভাব মূর্ত এদেশের জন-জীবনযাত্রায়। আফগানিস্তানের মানুষেরা পরিশ্রমী ও সংগ্রামী। রুক্ষ ও অনুর্বর পার্বত্যভূমিতে সবুজের সম্ভাবনা সৃষ্টির জন্য এদেশের মানুষকে করতে হয় কঠোর পরিশ্রম। বৈরী প্রকৃতির সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে বাঁচতে হয়, নির্বাহ করতে হয় জীবিকা। তবে সাম্প্রতিককালে মান্ধাতা আমলের কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন হয়ে এসেছে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি; চালু হয়েছে সমবায়, যৌথ খামার ও বৈজ্ঞানিক পানি সেচ পদ্ধতি। শিল্পক্ষেত্রেও ঘটেছে প্রশংসনীয় অগ্রগতি। আফগানিস্তান থেকে প্রধানত রপ্তানি হয়ে থাকে কৃষি ও কুটির শিল্পজাত পণ্য। এসবের মধ্যে রয়েছে তুলা, পশম, তৈলবীজ, চামড়া, টুপি, কার্পেট, পশমবস্ত্র, নানা রকম তাজা ও শুকনো ফলমূল ইত্যাদি। মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আফগানিস্তান। তামা, সীসা, রূপা, করলা, গ্যাস, লোহা, এসবেস্টস প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

খনিজের রয়েছে সুবিশাল সম্ভার। ভূপ্রকৃতি, ভাষা এবং নৃতাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাংলাদেশ ও বাঙালিদের সাথে আফগানিস্তান ও আফগান জনগণের তেমন সাদৃশ্য পরিলক্ষিত না হলেও ধর্ম বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, আচার-অনুষ্ঠান, নীতি ও আদর্শবোধ এবং মানসিকতার দিক দিয়ে দু'দেশের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাস এক। সহজ সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত দু'দেশের জনগণ। বাঙালির মতো আফগান সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে মরমী চেতনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাষাগত ভিন্নতা সত্ত্বেও দু'দেশের সাহিত্য বিশেষ করে লোক সাহিত্য ও সংস্কৃতির বহু ক্ষেত্রেই সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বাঙালি ও আফগান জনগণের অনুভূতিরও মিল রয়েছে। দু'দেশের মানুষই স্বাধীনতাকে প্রাণের চেয়ে প্রিয় এবং পবিত্র বলে মনে করে।

আফগানিস্তান আমাদের প্রতিবেশী দেশ না হলেও অত্যন্ত সুপরিচিত। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বহুযুগ ধরেই চালু ছিলো। তাই বাণিজ্যিক লেনদেনের প্রয়োজনে দু'দেশের মধ্যে প্রতিনিধি গমনাগমনও অব্যাহত ছিলো। ফলে উভয় দেশই একে অপরের সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে ওয়াকিবহাল। আফগানিস্তানের একটি মানুষ দেখতে কি রকম এবং তার আচরণ ও পরিবেশ আমাদের নিকট অজানা নয়। দু'দেশের মধ্যে ভৌগোলিক কোনো সান্নিধ্য নেই, এমনকি আফগানিস্তানের পর্বত সঙ্কুল পারিপার্শ্বিকতার সাথে বাংলাদেশের শ্যামল শোভার মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু আফগানিস্তানের সকল অধিবাসীই মুসলমান। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীই মুসলমান। তাই ধর্মীয় বন্ধনে আমরা বরাবরই তাদের সাথে আবদ্ধ। আফগানিস্তানের বহু শহর ও জনপদের নাম আমরা কথাস্থলে অনেক সময়ই উচ্চারণ করে থাকি। আমাদের দেশের সাহিত্যে, গল্পে, কবিতায় আফগানিস্তানের বহু জনপদের, বহু লোকালয়ের নাম উল্লেখ আছে। আফগানিস্তানের অনেক কাহিনী, অনেক গল্প আমাদের দেশের সাহিত্যের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালে দেখতে পাই আফগানিস্তানের পাহাড়-পর্বত সঙ্কুল এলাকা দিয়েই সর্বপ্রথম উপমহাদেশে অভিযান পরিচালনা করেছে বিদেশী আক্রমণকারীরা। গ্রিকবীর আলেকজাণ্ডার হতে শুরু করে শক, হুন, পাঠান, মুঘল যারাই এই উপমহাদেশে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে তাদের সকলেরই সর্বপ্রথম আগমন ঘটেছিলো আফগানিস্তানের মধ্য

Dhaka University Institutional Repository

দিয়েই। তাই এ উপমহাদেশে আফগান সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিলো বহুযুগ পূর্ব হতেই।

উপমহাদেশের অংশ হিসেবে আমরাও সেই সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও সভ্যতার স্পর্শ পেয়েছিলাম। আফগানিস্তানের বহু লোকই রুটি রুজির সন্ধানে এদেশে এসেছে। এ দেশের মানুষের আচার ব্যবহার ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তারা ভিন্নতা পেলেও তাদের কাছে তা অনভিপ্রেত মনে হয়নি। আমাদের সামাজিক রীতিনীতির সাথে অনেকেই বেশ সামঞ্জস্য রেখে বছরের পর বছর এদেশে কাটিয়ে গিয়েছে। বাঙালিদের ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে নীতি ও কর্মধারায় অভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের বিরোধিতা এ দু'দেশের রাষ্ট্রীয় নীতি। দু'টি দেশই জোট নিরপেক্ষ আদর্শে বিশ্বাসী।

দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান সব সময়ই নিজেদের বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে মনে করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে উভয় দেশই মুসলিম দেশ এবং উভয় দেশই ওআইসিভুক্ত। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান দু'টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। উভয় দেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে মাঝখানে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান। কৌশলগত অবস্থানের কারণে দু'টি দেশেরই ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত নামে যে দু'টি রাষ্ট্রের জন্ম হয় সেখানে বাংলাদেশ পাকিস্তানেরই অংশ ছিলো। আর পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের সরাসরি সীমানা রয়েছে। এ সীমান্ত এলাকায় স্বল্প পরিসরে বিভিন্ন সমস্যা থাকলেও বাংলাদেশের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক বরাবরই ভালো ছিলো। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন পরাশক্তি ও প্রতিবেশী দেশসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিকে জড়িয়ে পড়লেও প্রতিবেশী আফগানিস্তান প্রত্যক্ষভাবে কোনো ভূমিকা রাখেনি। তবে বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে এদেশের ন্যায়সঙ্গত স্বাধীনতার প্রতি সক্রিয় সমর্থন ছিলো যা যুদ্ধকালীন ঘটনা ও যুদ্ধপরবর্তী দু'টি দেশের বৈদেশিক সম্পর্ক বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠে। যুদ্ধকালীন সময়ে

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানের প্রত্যক্ষ সমর্থন না থাকার পেছনে আমরা ওআইসিভুক্ত অন্যান্য দেশের মনোভাবকে দায়ী করতে পারি। ওআইসিভুক্ত সকল দেশ একটি শক্তিশালী মুসলিম দেশ পাকিস্তান ভেঙ্গে যাক এটা চায়নি। সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি আফগানিস্তানের যৌক্তিক সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ওআইসির সদস্য হওয়ার কারণে সেটা প্রকাশ করতে পারেনি। তবে যুদ্ধকালীন সময়ে ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে (পাকিস্তান-বাংলাদেশ যুদ্ধবন্দি বিনিময় চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত) আটক বাঙালিদের বাংলাদেশে পালিয়ে আসার ব্যাপারে আফগানিস্তান তার সীমান্ত ব্যবহার করতে দিয়েছিলো। শুধু তাই নয় যুদ্ধকালীন সময়ে আফগানরা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা বাঙালি মুসলিম ভাইদের আশ্রয়, অন্ন প্রভৃতি দিয়ে সহায়তা করেছিলো। পরবর্তীকালে পাকিস্তান-বাংলাদেশ যুদ্ধবন্দি বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে বাঙালিদের দেশে ফেরার ব্যাপারে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে প্রথম যে সকল যুদ্ধবন্দি বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসে তাতে আফগানিস্তান তার আরিয়ানা এয়ার লাইন্সের বিমান দিয়ে সহযোগিতা করে।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের অন্য দেশের সাথে সম্পর্ক নির্ধারিত হয় তার জাতীয় স্বার্থে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান ব্যতিক্রম নয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের পক্ষে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিলো। তাই যুদ্ধপরবর্তীকালে এ দু'টি দেশ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে বিশাল জায়গা দখল করে নেয়। অপরপক্ষে, ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনীহা কাজ করার কারণে প্রথমদিকে এ সকল দেশ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে তেমন কোনো প্রভাব রাখেনি। ১৯৭৩ সালের দিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মুজিব সরকার এসময় থেকে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ওআইসির সদস্য পদ লাভ করে। ওআইসির সদস্যপদ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আফগানিস্তান যথেষ্ট ভূমিকা রাখে। মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের সাথে সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি অনেকটা পশ্চিমা ব্লকেও ঝুঁকে পড়ে। পশ্চিমা ব্লকে প্রবেশ ও মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের সাথে সাথে ভারত ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ শেখ মুজিবের মৃত্যু ও রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে ক্ষমতায় আসেন খোন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান। এসময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি বিশ্লেষণ করলে তিনটি দিক লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, জিয়াউর রহমান মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেন, দ্বিতীয়ত, চীনের সাথে মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ে তোলেন ও তৃতীয়ত, পশ্চিমা ব্লকে পুরোপুরি প্রবেশ করেন।

জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর (৩০মে, ১৯৮১) সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ২২ মার্চ, ১৯৮২ ক্ষমতায় আসেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ। জিয়াউর রহমানের মৃত্যু ও এরশাদের ক্ষমতায় আসার মধ্যবর্তী সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। কারণ এসময় দেশের মধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো। এরশাদ সরকার তাঁর পররাষ্ট্রনীতিতে অনেকটা জিয়াউর রহমানের অনুসৃত নীতিই গ্রহণ করেন এবং তাঁর পররাষ্ট্রনীতির অনেকটা অংশ জুড়ে ছিলো মুসলিম বিশ্ব। ২৪ মার্চ, ১৯৮২ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তিনি যে ভাষণ দেন তাতে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ব্যাপারে ইঙ্গিত প্রদান করেন।[১]

বাংলাদেশে ১৯৭১-১৯৯০ পর্যন্ত বিশ বছরে মোটামুটি তিনটি সরকার ক্ষমতায় ছিলো। এগুলো হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৭১-৭৫), জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার (১৯৭৫-৮১) এবং হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির সরকার (১৯৮২-৯০)। তবে পঁচাত্তরের আগস্ট পরবর্তী সময়ে অল্প সময়ের জন্য মোশতাকের ডেমোক্রেটিক লীগ ক্ষমতায় এসেছিলো। এ অভিসন্দর্ভে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ও ঠাঁই পেয়েছে। কেননা মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী দিনগুলোতে আফগানিস্তানের সাহায্য সহযোগিতা বাংলাদেশের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ককে আরো উষ্ণ করে।

অধ্যায় বিভাজন

বৃহৎশক্তির রাজনীতির কারণে ও বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলোর কোনো সমর্থন না থাকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আফগানিস্তান কোনো সক্রিয় সহযোগিতা করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেনি। কিন্তু আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের শাশ্বত যোগাযোগ ছিলো। এছাড়া স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানে আটকেপড়া বাঙালিদের দেশে ফেরা ও তাদের খাদ্য ও সাহায্য দিয়ে আফগানিস্তান সহযোগিতা করেছে। ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি[২] দেবার পর দুই দেশের মধ্যে প্রতিনিধি গমনাগমন ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতির কিছু অভিন্ন উপাদান তাদের এ সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রাখে। এখানে যে বিষয় দু'টি প্রাধান্য পাবে তা হল প্রথমত, অভিসন্দর্ভের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা ও দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের মধ্যে বিশ বছর (১৯৭১-১৯৯০)-এর সম্পর্কের প্রকৃতি মূল্যায়ণ করা। তবে অভিসন্দর্ভের প্রয়োজনে দু'টি দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগাযোগ বিষয়টিও তুলে ধরা হয়েছে।

সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে উভয় দেশের সম্পর্কের তত্ত্ব কাঠামো ও নির্ধারক আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান উভয়দেশ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রভুক্ত এবং ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে সংজ্ঞায়িত হওয়ার সকল শর্ত যেমন– ক্ষুদ্র আয়তন, স্বল্প জনসংখ্যা, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্বল্প প্রভাব, স্বল্প মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন ক্ষমতা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বিদ্যমান। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেমন– অনুন্নত অর্থনীতি, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্রে সংকট উভয় দেশেই লক্ষ্যণীয়। অবশ্য এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তান জোট নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ, বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা, বৃহৎশক্তির সঙ্গে মৈত্রী ও আঞ্চলিক মৈত্রী স্থাপনকে প্রধান্য দিয়ে থাকে। উভয় দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পররাষ্ট্রনীতিতে কিছু কিছু অভিন্ন উপাদান পরস্পরকে আকৃষ্ট করেছে। বিশেষ করে উভয় দেশের ঔপনিবেশিকতার অভিজ্ঞতা, ভারত ও পাকিস্তান পরিবেষ্টিত ভৌগোলিক অবস্থান, পাকিস্তান ও ভারত কেন্দ্রিক নিরাপত্তা সমস্যা এবং পাকিস্তানের সাথে অমীমাংসিত ইস্যু বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানকে কাছাকাছি এনে দিয়েছে। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আত্মরক্ষা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, নিজস্ব শক্তি সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি, নিজস্ব মতবাদে অটল থাকা, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি ছাড়াও উভয় দেশই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। উভয় দেশই তাই জাতিসংঘ, ওআইসি, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনসহ বিভিন্ন ফোরামে অবদান রাখার চেষ্টা করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্ব কাঠামোর ক্ষেত্রে দু'টি তত্ত্ব আদর্শ ও জাতীয় স্বার্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বেশ কিছু দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায়, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে আদর্শ ন্যূনতম ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেখা যায়, শেখ মুজিব ও সর্দার দাউদ উভয়েই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং রাশিয়ান ব্লকে ঝুঁকে পড়েছে। অবশ্য অভ্যন্তরীণ রাজনীতির টানাপোড়েনে ও কূটনৈতিক বাস্তবতার স্বার্থে উভয় দেশ ক্রমান্বয়ে একই আদর্শ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং পররাষ্ট্রনীতিতে-এর প্রভাব পড়ে।

মুজিব পরবর্তী সরকারগুলো আদর্শ থেকে আরো দূরে সরে এসে সামরিক শাসনের অধীনে অগণতান্ত্রিক পন্থা অবলম্বন এবং ধর্ম ও ধর্মীয় আবেগকে রাষ্ট্রীয় জীবন ও পররাষ্ট্রনীতিতে প্রাধান্য দিতে শুরু করে। এ আদর্শ ও প্রবণতার অভিন্ন রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতির অনুসারী এ দু'টি দেশ ক্রমান্বয়ে পারস্পরিক নৈকট্যের সম্পর্কের লক্ষ্যে তৎপর হয়ে উঠে।

উভয়দেশের নির্ধারকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ধর্ম ও পাকিস্তান কেন্দ্রিক নিরাপত্তা সমস্যা শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছে। এছাড়া উভয় দেশের পরিপূরক অর্থনীতি ঐতিহ্য-সংস্কৃতি, উভয় দেশের বাণিজ্যিক নির্ভরশীলতা পরস্পরকে আরো কাছে এনে দেয়। এক্ষেত্রে উভয় দেশের অভিন্ন পররাষ্ট্রনীতি ছাড়াও আন্তর্জাতিক ফোরামে বিভিন্ন ইস্যুতে ঐকমত্য, রাশিয়ান ব্লকে সহাবস্থান, পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্ব নির্ভরশীলতা অন্যতম নির্ধারক হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে।

মুজিব আমলে পাকিস্তানে আটক বাঙালি উদ্ধার, জাতিসংঘে বাংলাদেশের যোগদান, ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে বলবৎ রেখেই ৩৫টি মুসলিম দেশের স্বীকৃতি অর্জন মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বড় সাফল্য। পরবর্তী শাসকেরা এসব দেশের সাথে সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যায় মাত্র। এক্ষেত্রে আফগানিস্তানের অবদান অপরিসীম। জিয়া সরকারের সময় থেকে ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের ফলে মুসলিম বিশ্বের বাংলাদেশের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি হয়। জিয়া আমলে এ বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েই পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতিতে পরিবর্তন সাধন করা হয়[৩] এবং পরবর্তীতে এরশাদ আমলেও একই ধারা অব্যাহত থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় উপমহাদেশের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, রাশিয়া ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার একটি প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলো। উপমহাদেশের দু'টি দেশ ভারত ও আফগানিস্তানের ঘনিষ্ঠতা রাশিয়াকে উপমহাদেশে প্রভাব বলয় তৈরিতে অনেকটা নিশ্চিত করেছিলো। আর এজন্যই রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করেছিলো। আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে পাকিস্তান সরাসরি যুক্ত ছিলো। কেননা পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ উভয়েরই অমীমাংসিত কিছু বিষয় ছিলো। আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান পাকিস্তান কেন্দ্রিক সংকটে একে অপরকে সমর্থন দেয়। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে দু'টি দেশ অভিন্ন মত পোষণ করে।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্কের ২০ বছরের (১৯৭১-১৯৯০), ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণে দু'টি দিক প্রাধান্য পায়। প্রথমত, দু'টি দেশের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ একে অপরকে সহমর্মিতা ও সার্বিক সাহায্য-সহযোগিতা দান। দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক নির্ভরতা বিশেষ করে বাণিজ্যিক সম্পর্ক তৈরির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন।

রাজনৈতিক বিষয়গুলোর মধ্যে স্বীকৃতি অর্জন, আটক বাঙালি উদ্ধারে সাহায্য, জাতিসংঘ সদস্যপদ, ওআইসি, ন্যাম প্রভৃতিতে সদস্যপদ লাভে সমর্থন, যুদ্ধবন্দি বিনিময় প্রভৃতি বিষয় প্রাধান্য পায়। এছাড়া রাশিয়ান আগ্রাসনে বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও স্থান পায়।

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান বন্ধুপ্রতীম দু'টি মুসলিম দেশ। দু'টি দেশের রয়েছে হাজার বছরের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক। সময়ের ধারবাহিকতায় তা কখনো কমেছে, কখনো বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয় দেশেরই রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনের অভিজ্ঞতা। এছাড়া উভয় দেশের মানুষের পছন্দ-অপছন্দ ও চিন্তা চেতনাতেও রয়েছে অসম্ভব মিল। এ প্রসঙ্গে বাঙালি সম্পর্কে জনৈক আফগানির উক্তি, ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। কিন্তু আপনার (বাঙালি) রঙ দিব্য বাদামী, আপনি প্রতিবেশী, আফগান আপনাকে বহু শতাব্দী ধরে চেনে– আপনি না হয় তাকে ভুলে গিয়েছেন, আপনারই জাতভাই

Dhaka University Institutional Repository

বহু ভারতীয় এখনো আফগানিস্তানে ছোটখাট নানা ধান্দায় ঘোরাঘুরি এমনকি বসবাসও করে।[৪] আফগানিস্তানের সাথে এ শাশ্বত যোগাযোগই স্থান পেয়েছে আলোচ্য অভিসন্দর্ভে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশগুলো অনেকটাই পাকিস্তানের ভাঙ্গন ও মুসলিম শক্তিকে নস্যাৎ করার একটি অপপ্রচেষ্টা মনে করায় যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের সমর্থন ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে। এমনকি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরেও মুসলিম দেশগুলো সহজে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। এদিক থেকে ব্যতিক্রম ছিলো আফগানিস্তান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের সাহায্য-সহযোগিতা ছিলো প্রণিধানযোগ্য। আফগানিস্তানে আটক বাঙালিদের খাবার, আশ্রয় ও দেশে ফেরার ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতা দিয়েছে।[৫] আবার স্বাধীনতার পর পরই ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ আফগানিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। স্বীকৃতি লাভের পর থেকেই শুরু হয় দু'টি দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়ন আর এরই ধারাবাহিকতায় শুরু হয় প্রতিনিধি গমনাগমন। ৩-১০জানুয়ারি, ১৯৭৩ ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার ড. এ.আর. মল্লিক সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে আফগানিস্তান গমন করেন।[৬] মে, ১৯৭৩ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমেদ আফগানিস্তান গমন করেন।[৭] মার্চ, ১৯৭৩ সুলায়মান বাংলাদেশে আফগানিস্তানের দূতাবাস স্থাপনের প্রস্তাব নিয়ে বাংলাদেশ সফরে আসেন।[৮] জুন, ১৯৭৩ ড. এ.আর. মল্লিক আফগানিস্তান গমন করেন।[৯] ১৪ মার্চ, ১৯৭৫ আফগান প্রেসিডেন্ট সর্দার মোহাম্মদ দাউদ বাংলাদেশে আসেন।[১০] তিনি বাংলাদেশ-আফগানিস্তান দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জল রাখতে বাংলাদেশকে সমর্থন দেন। জাতিসংঘে সদস্যপদ প্রাপ্তি থেকে শুরু করে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ,[১১] জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে সদস্যপদ প্রাপ্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে আফগানিস্তান বাংলাদেশকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। অপরপক্ষে আফগানিস্তানের দুঃসময়ে বাংলাদেশ বন্ধুত্বের প্রমাণ দিয়েছে তার বক্তব্য ও কর্মে।

আফগানিস্তানে রাশিয়ার আগ্রাসনে বাংলাদেশ নিন্দা প্রকাশ করেছে এবং আফগান জনগণের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্ধারণ করবে এরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছে সকল আন্তর্জাতিক ফোরামে। এছাড়া আলোচ্য অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশ–আফগানিস্তান বাণিজ্যিক বিষয়টিও স্থান

Dhaka University Institutional Repository

পায়। ১৯৭৪ সালে আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ্‌র বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে দু'টি দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্কের যাত্রা শুরু হয়[১২] এবং তা অব্যাহত থাকে জিয়া আমলের প্রায় শেষ পর্যন্ত। কিন্তু এসময়ে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের কারণে বিশ্বের অপরাপর দেশের ন্যায় আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান উভয়ই দক্ষিণ এশীয় দেশ। ওআইসি, জোটনিরপেক্ষ প্রভৃতি ফোরামের সদস্য হিসেবে এ দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক নীতি একইরূপ। এছাড়া বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে দু'টি দেশের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থানের মিল রয়েছে। উপরন্তু রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক বিষয়ক বিভিন্ন গবেষণাগ্রন্থ রচিত হলেও বাংলাদেশ–আফগানিস্তান বিষয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণাগ্রন্থ আজও রচিত হয়নি। এ অভিসন্দর্ভে স্বল্প সময়ের জন্য হলেও আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় হয়তো একদিন বাংলাদেশ–আফগানিস্তান অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থও রচিত হবে।

বিশ্লেষণের তত্ত্ব কাঠামো

তত্ত্বগতভাবে বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রনীতির যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য থাকে বাংলাদেশ তা থেকে তেমন ব্যতিক্রম কিছু নয়। বাংলাদেশ–আফগানিস্তান সম্পর্ক বিশ্লেষণে তত্ত্ব কাঠামোর দিকটি দু'টি প্রস্তাবনার নিরিখে আলোচনা করা যায়। একটি আদর্শগত দিক এবং অন্যটি জাতীয় স্বার্থ।

স্বাধীনতার পর তৃতীয় বিশ্বের একটি সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জন্য প্রধান চাহিদা ছিলো আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোর দ্রুত উন্নয়ন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন ছিলো অভ্যন্তরীণ শান্তি, স্থিতিশীলতা ও বহির্বিশ্বে যথাযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদার আসন। দক্ষিণ এশিয়ার মানচিত্রে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের রাজনৈতিক গুরুত্ব অনুধাবন না করে এধরনের নীতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। আর সে কারণেই পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার সাথে সম্পর্কহীন অতিমাত্রায় আদর্শায়িত নীতি অবাঞ্ছনীয় প্রতীয়মান হয়েছিলো। উপরন্তু জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি ছিলো বিশেষভাবে বিবেচ্য।[১৩] মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষক আলফ্রেড ডি মাহানের মতে, জাতীয় স্বার্থ পররাষ্ট্রনীতির শুধু বৈধই নয়, মৌলিক উদ্দেশ্যও বটে। যে কোনো সরকারের কাছ থেকে নিরবিচ্ছিন্নভাবে জাতীয় স্বার্থ ছাড়া অন্য কারণে কার্য সম্পাদন আশা করা যায় না। পররাষ্ট্রনীতির জাতীয় স্বার্থের ভূমিকা সম্পর্কে সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামার স্টোন মন্তব্য করেন, আমাদের কোনো শাশ্বত মিত্র নেই এবং আমাদের চিরস্থায়ী শত্রুও নেই। আমাদের স্বার্থই হলো শাশ্বত ও চিরস্থায়ী এবং সে স্বার্থকে অনুসরণ করাই হলো আমাদের দায়িত্ব।[১৪]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আদর্শ কিছুটা প্রভাব ফেললেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নতুন নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ফলে তারা জাতীয় স্বার্থকে অধিক প্রাধান্য দেয়। বেশিরভাগ রাষ্ট্র তখন রাজনৈতিক ও আইনগত বৈধতার প্রশ্নে আদর্শকে ব্যবহার করলেও জাতীয় স্বার্থই প্রধান হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ করা যায়– রুশ-যুগোস্লাভ সংঘাত, রুশ-চীন সংঘাত, রুশ-চেকোস্লোভাকিয়া সংঘাত, ভিয়েতনাম সংঘাত প্রভৃতি। এখানে নীতি আদর্শের চেয়ে জাতীয় স্বার্থই অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে।

অভ্যুদয়ের প্রথম লগ্ন থেকেই বাংলাদেশ পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র কোনো বিশেষ মতবাদ দ্বারাই সক্রিয়ভাবে পরিচালিত হয়নি । যদিও মুজিব আমলের প্রথমদিকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে সমাজতন্ত্র যুক্ত হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ নীতি আদর্শের অনুসারী হয়। কেননা নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ দ্বারা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো প্রভাবিত নয় বরং আদর্শের চেয়ে জাতীয় স্বার্থকেই জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো প্রাধান্য দেয়।

পররাষ্ট্রনীতির সিদ্ধান্ত গ্রহণের বেলায় যে কোনো রাষ্ট্র (বৃহৎ, মাঝারি বা ক্ষুদ্র) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী তার নিজস্ব জাতীয় স্বার্থকে বিবেচনায় এনে রাষ্ট্রটি যে কোনো সিদ্ধান্ত নেবে

Dhaka University Institutional Repository

এটাই স্বাভাবিক। স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে রুশ প্রভাব বলয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। এটি ঘটেছিলো কোনো আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয় বরং জাতীয় স্বার্থের কারণেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া ছিলো বাংলাদেশের পক্ষশক্তি। অপরপক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়ে আসছিলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের সখ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো বেশ পূর্ব হতেই। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ৭ অক্টোবর, ১৯৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিলো।

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের নিজ নিজ ভাবমূর্তি ও জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রতিটি ঘটনা মূল্যায়ন করে থাকে। অপরদিকে রাশিয়া দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় তার প্রভাব বলয় গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলো। এজন্য তার বাংলাদেশের সমর্থন প্রয়োজন ছিলো। আবার আফগানিস্তান সমস্যায় রাশিয়া ছিলো আফগানিস্তানের সমর্থক। নিজ দেশের জাতীয় স্বার্থে আফগানিস্তানের অবস্থান ছিলো সোভিয়েতের পক্ষে।[১৫] ফলশ্রুতিতে ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশসমূহ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন জানালেও আফগানিস্তান সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশকে।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সময় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নতুন মোড় নেয়। এসময় বাংলাদেশ রুশ প্রভাব বলয় থেকে ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। আর এ পরিবর্তনের পেছনে মূলত জাতীয় স্বার্থই কাজ করে। জিয়াউর রহমান জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সম্মেলনে যখন যোগ দিয়েছেন তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুসুলভ কথাবার্তা হয়েছে এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইস্যুতে একই ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়া সমস্যা।[১৬] এখানে বলে রাখা দরকার যে, জিয়াউর রহমান ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্ক ভালো করার জন্যই আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন ইস্যুতে আফগানিস্তানকে সমর্থন করেছে।[১৭] একইভাবে এরশাদ আমলেও দেখা যায়, আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনে বাংলাদেশ আফগানিস্তানকে সমর্থন করেছে এবং রাশিয়ার বিরোধিতা করেছে। এরশাদ সরকারও ওয়াশিংটনের সাথে সম্পর্ক ভালো করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্যই এরূপ করেছে বলে মনে করা হয়। আর এখানে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থই ছিলো মূল বিষয়।[১৮]

বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ যেসব বিষয়গুলোর উপর নির্ভরশীল তা হলো সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণ, বিশ্ব দরবারে স্বীকৃতি অর্জন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক পূনর্গঠন প্রভৃতি।

নির্ধারকসমূহ

ভূ-রাজনৈতিক নৈকট্য: বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান দু'টি দেশেরই অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়। দু'টি দেশের অবস্থান একই মহাদেশ ও অঞ্চলে হওয়ায় উভয় দেশ একই ধরণের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। উভয় দেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে মাঝখানে ভারত ও পাকিস্তানের অবস্থান। কৌশলগত অবস্থানের কারণে দু'টি দেশেরই ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমানে বাংলাদেশ আফগানিস্তান দু'টি পৃথক দেশ হলেও এক সময় তারা ভারতবর্ষের অভিন্ন অংশ ছিলো। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের খাইবার পাস গিরিপথ হয়ে আক্রমণকারীরা আসত ভারতবর্ষের ক্ষমতা ও অর্থের কারণে। গ্রিকবীর আলেকজান্ডার হতে শুরু করে শক, হুন পাঠান সবাই এ পথ ধরেই এসেছে। মধ্য এশিয়া হতে তাতার, মোঙ্গল, চেঙ্গিস খান, ভারতবর্ষে আসার জন্য এ পথকেই ব্যবহার করেছে। সময়ের পথ ধরে আরো এগিয়ে এলে দেখা যায় ব্রিটিশ আমলে আজকের বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তান উভয়ই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবী মূলত দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক; অপরটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী ব্লক। রাশিয়ার নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লক এশিয়ায় তার সাম্রাজ্য গড়তে ভারত ও আফগানিস্তানকেই বেছে নেয়। পরবর্তীতে তারা বাংলাদেশের দিকে দৃষ্টি দেয় যার প্রত্যক্ষ ফলাফল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়ার সক্রিয় সহযোগিতা।

ইসলাম ধর্ম, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি : যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ধর্ম অন্যতম নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান দেশ দু'টি এ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান দু'টি মুসলিম দেশ। উভয় দেশেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী মুসলিম। এ কারণে উভয়দেশের চিন্তা চেতনা ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অবস্থান একই কাতারে। উভয়ই ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ। তারা মুসলিম ঐক্য সংহতি সাধনে সদা তৎপর। এ জন্যই মুসলিম বিশ্বের যে কোনো রাষ্ট্রের যে কোনো সমস্যায় দু'দেশের অবস্থান একই কাতারে। যেমন– ইরাক-ইরান যুদ্ধ। আবার বসনিয়ায় মুসলিম নিধনকে উভয়ই দেশই কঠোর ভাষায় নিন্দাবাদ জানিয়েছে, মুসলিম নিধনকে বন্ধ করতে বিশ্বব্যাপী জনমত তৈরিতে সাহায্য করেছে।

পররাষ্ট্রনীতির অভিন্নতা: বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন মনোভাব ও মতামত ব্যক্ত করে আসছে। উভয়ই ক্ষুদ্র ও ঋণ নির্ভর উন্নয়নশীল দেশ। বৃহৎ শক্তি তথা শক্তিধর দেশগুলো উভয় দেশেরই শীর্ষস্থানীয় দাতা। দু'টি দেশই জাতিসংঘ, ওআইসি ও কমনওয়েলথের সদস্যভুক্ত। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যভুক্ত উভয় দেশই দীর্ঘকাল ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিলো। উভয় দেশ বিভিন্ন সম্মেলনে একই ধরনের মতামত পোষণ করে এবং বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যায় একযোগে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। যেমন– ইরাক-ইরান যুদ্ধ, আরব ভূখণ্ড থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার, প্যালেস্টাইনের মুক্তি সংগ্রাম প্রভৃতি।[১৯] উভয়ই বর্ণবাদের বিরুদ্ধে, স্বাধীনতার স্বপক্ষে। দু'টি দেশই দক্ষিণ এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত ও শান্তির এলাকা ঘোষণায় তৎপর। এভাবে একই ধরনের মতামত ও মনোভাব, বিভিন্ন সমস্যায় একযোগে ভোটাধিকার ও আরব বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখার জন্য দু'টি দেশের মধ্যে যে নৈকট্য অর্জিত হয়েছে, তা দু'টি দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। ফলে দু'টি দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ পরিবেশ: পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে শাসক এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও জনগণের মনমানসিকতা এবং ইতিহাস ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করা যায় না। তাই সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে সরকারগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়।[২০] বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে যে সকল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে তার অন্যতম কারণ অভ্যন্তরীণ পরিবেশ। দু'টি দেশের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

ভৌগোলিক ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও উভয়ের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে রয়েছে মিল। উভয়ই ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়ায় এবং হাজার বছরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ থাকায় উভয় দেশের জনগণ নিজেদের সবসময় একই জাতিগোষ্ঠী মনে করেছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে একাত্মতা অনুভব করেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে বিষয়গুলো স্পর্শকাতর তা দু'টি দেশের মানুষকে স্পর্শ করেছে।

বৃহৎ শক্তির নৈকট্য: বাংলাদেশ–আফগানিস্তান সম্পর্ক দ্বিপাক্ষিক হলেও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলো বৃহৎশক্তি। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে পরাশক্তির হস্ত ক্ষেপের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলো। পরবর্তীতে মার্কিন নীতির বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে আসে। আবার একথাও সমভাবে প্রযোজ্য যে, রাশিয়ার গতিপ্রকৃতির উপরই অর্থাৎ কমিউনিজমের প্রসারকে প্রতিহত করার জন্যই অনেকটা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আবির্ভাব। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহী হবার পেছনে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও কৌশলগত কারণগুলো সমন্বিতভাবে কাজ করেছে। কমিউনিজমের ক্রম প্রসারের কারণেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এর ফলেই শুরু হয় Containment নীতির; যার স্রষ্টা হলেন জর্জ কেনান। এ নীতি বাস্তবায়নের জন্য আফ্রিকা থেকে দূরপ্রাচ্য পর্যন্ত সামরিক ঘাঁটির প্রয়োজন ছিলো। এ কৌশলগত পরিকল্পনায় দক্ষিণ এশিয়া একটি সংযোগস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়। পাকিস্তান, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের পাশে অবস্থিত আফগানিস্তানের খাইবার গিরিপথ একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল। এখান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মধ্যপ্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দিকে দৃষ্টি রাখা সহজতর। এ কারণে এসময় থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে সখ্যতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সহযোগিতা দিতে থাকে। পক্ষান্তরে, ভারত মার্কিন নীতিকে প্রত্যাখ্যান করে।

অপরপক্ষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সম্পর্ক সুপ্রাচীন। সোভিয়েত ইউনিয়ন বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রমণের কথা চিন্তা করেছে। কিন্তু তৎকালীন সময়ে নিজের দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজেই তাকে এতো ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, সে ব্যাপারটা ততোটা

Dhaka University Institutional Repository

এগোয়নি। পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন তৃতীয় বিশ্ব তথা দক্ষিণ এশিয়ায় একটি নতুন পরাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময়ে মধ্যস্থতাকারী রাষ্ট্রের ভূমিকা পালন করেই রাশিয়া প্রথম দক্ষিণ এশীয় ভূখণ্ডে বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠে। রাশিয়ার এ কূটনৈতিক প্রয়াসের পেছনে মূল ভিত্তিই হলো রাশিয়া বাইরের পৃথিবীকে জানাতে চেয়েছিলো দক্ষিণ এশিয়া তার প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত এলাকা। ষাটের দশকে আমেরিকা যতই ভিয়েতনাম সমস্যায় গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলো রাশিয়া ততই দক্ষিণ এশিয়ায় প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন দ্বারা রাশিয়া পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার ভারতীয় প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়েছিলো। কারণ রাশিয়া ভারতের মাধ্যমেই দক্ষিণ এশিয়ায় রুশ প্রভাব বলয় তৈরি করতে চেয়েছে। আবার ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশসমূহ পাকিস্তানকে সমর্থন জানালেও আফগানিস্তান বাংলাদেশ সৃষ্টিতে সহযোগিতা করেছে। এখানে বলে রাখা দরকার যে, আফগানিস্তান ছিলো রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্য নির্দেশ

১. *The Bangladesh Observer,* 25 March, 1982

২. The Pakistan Institute of International affairs, *Pakistan Horizon,* , Vol. XXVI, No- 1, first Quarter, (Karachi: 1973), p. 80

৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্ব", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা,* (অক্টোবর, ১৯৮৪), পৃ. ১৪৬। আরো দ্রষ্টব্য, *The Bangladesh Observer,* 2 May, 1976

৪. সৈয়দ মুজতবা আলী, *দেশে বিদেশে,* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪১০ বাংলা), পৃ. ৫০

৫. Fakhruddin Ahmed, *Critical Times, Memories of a South Asian Diplomat,* (Dhaka: UPL, 1994), P.P. 86-87

৬. *দৈনিক স্বদেশ,* ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩

৭. *দৈনিক বাংলা,* ১৯ মার্চ, ১৯৭৬

৮. *The Bangladesh Observer,* 02 March, 1973.

৯. *দৈনিক বাংলা,* ১৪ জুন, ১৯৭৩

১০. *দৈনিক আজাদ,* ১৮ মার্চ, ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

১১. Noor Ahmed Baba, *Organization of Islamic Conference Theory and Practice of Pan-Islamic Co-operation,* (Dhaka: UPL, 1994), p.p. 85-89

১২. *The Bangladesh Times,* 3 June, 1974

১৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৩

১৪. Norman S. Padelford and George A. Lincoin, *The Dynamies of International Politics* (New York: The Macmillan, 1962) p. 234

১৫. Denis Wright, *Bangladesh Origien and Indian Ocean Relation* (Dhaka: Academic Publications, 1988), p. 261

১৬. *Ibid.* P. 71

১৭. Sarbijit Sharma, *US Bangladesh Relation* (Dhaka: University Press Limited, 2001), p. 148

১৮. *Ibid.* p. 148

১৯. ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক,১৯৭১-১৯৮১*, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৫৪

২০. ঐ, পৃ. ৪৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : ঐতিহাসিক যোগসূত্র

রাজনৈতিক যোগসূত্র

দেশ হিসেবে আফগানিস্তান প্রাচীন; সময়ের বিবর্তনে হয়ত নামের পরিবর্তন হয়েছে। গ্রিক ভূগোলবিদ ক্লডিয়াস টলেমি (২য় শতক) ও অন্যান্যরা খোরাসানসহ বর্তমান আফগানিস্তানকে আরজানা (Arjona) নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। কারো কারো মতে আফগান সভ্যতা টলেমির সময়ের চেয়েও প্রাচীন।[১] আফগানিস্তান দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার স্থল বেষ্টিত একটি রাষ্ট্র যার উত্তরে তুর্কিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান; পশ্চিমে ইরান, উত্তর-পূর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন এবং দক্ষিণ-পূর্বে পাকিস্তান অবস্থিত।[২] স্থলবেষ্টিত আফগানিস্তান রাষ্ট্রের আয়তন ৬,৪৭,৪৯৭ বর্গ কিলোমিটার (২,৫০,০০০ বর্গ মাইল) যা প্রায় টেক্সাস রাজ্যের সমান। এর উত্তর-দক্ষিণে মোট দূরত্ব ৫৬৩ কিলোমিটার (৩৫০ মাইল) এবং পূর্ব-পশ্চিমে দূরত্ব ১,২৩৯ কিলোমিটার (৭৭০ মাইল) এবং দেশটির মোট আন্তর্জাতিক সীমানা ৭,৭৭০ কিলোমিটার (৩,৫৮৫ মাইল)। পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে রয়েছে ডুরাণ্ড লাইন (Durand Line) যা নিয়ে দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১৮৯৩ সাল থেকে বিরোধ চলছে এবং এ লাইনটি ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হয়েছিলো।[৩]

আফগানিস্তানের সাথে বাংলা তথা ভারতবর্ষের যোগসূত্র দীর্ঘদিনের। তবে আফগানিস্তান সম্পর্কে লিখিত উৎস খুবই কম। বিশেষ করে সুলতান মাহমুদের (৯৯৭-১০৩০) পূর্ব পর্যন্ত আফগানিস্তানের তেমন লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে আফগানিস্তানের সুলতান মাহমুদপূর্ব ইতিহাস অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান মেলে শুধু সেদেশের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাধ্যমেই। পুরাণ, মহাভারত ও ভারতীয় সাহিত্যিক উপাদনেও কিছু তথ্য রয়েছে। দু'টি মহাকাব্য (মহাভারত ও রামায়ণ)-এ বর্ণিত ঘটনাবলির

Dhaka University Institutional Repository

সময়কাল হল ১০০০-৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ।[৪] ভূমির অধিকার নিয়ে কৌরব ও পাণ্ডবদের কুরুক্ষেত্রের যে যুদ্ধ হয় তা নিয়েই মহাভারতের বিস্তার। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টপূর্ব ৯৫০ অব্দে কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সম্ভবত এই যুদ্ধ বেঁধেছিলো।[৫]

বর্ণিত আছে:

সবাকার অঙ্গে অস্ত্র করিল প্রহার।
সহস্র সহস্র বীর হইল সংহার।।
লক্ষ লক্ষ তুরগ পাখি রথ রথী।
অর্ব্বুর্দ অর্ব্বুর্দ কত পড়িল পদাতি।।
অনন্ত ফলীন্দ যেন মথে সিন্ধুজল।
দুই ভাই রাজগানে মথিল সকল।।[৬]

দিল্লীর উত্তরের উর্বর ও গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলটি হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঘটনাস্থল।[৭] যার অনেকাংশই বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যে বিবরণ মেলে তা নিম্নরূপ :

জিজ্ঞাসে বৈশপায়নে শ্রীজনমেজয়।
কুরুক্ষেত্র মাহাত্মাদিবল মহাশয়।।
পূণ্যক্ষেত্র কি প্রকারে হৈল সেই স্থান।
আমারে বলহ মুনি করিয়া ব্যাখ্যান।।
শুনি বলে, শুন পরীক্ষিতে নন্দন।
তোমারে জানাই কুরুক্ষেত্র-বিবরণ।।[৮]

মহাভারতের অন্যত্র উল্লেখ আছে:

রাজা বলে সুরপতি কর অবধান।
মোরে বর দিয়া প্রভু কর সমাধান।।

Dhaka University Institutional Repository

সহস্র বৎসর আমি চাষ ছিনু ভূমে।

কুরুক্ষেত্র বলি নাম হউক ভূবনে।।[৯]

যদিও মনে করা হয় প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদঘাটনের মাধ্যমে আফগানিস্তানের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার সম্ভব। কিন্তু এখন পর্যন্ত পাকিস্তান ও ভারতের মতো আফগানিস্তানে ব্যাপক প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন কাজ সম্ভব হয়নি বলে আফগানিস্তানের ইতিহাস আজও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এছাড়া আফগানিস্তানের কোনো গবেষকও এ রকম কোনো উদ্যোগ নেননি।

কিন্তু সুলতান মাহমুদ, মুঘল বাদশাহ বাবর, আফগান বীর শেরশাহসহ অন্যান্য শাসকদের ইতিহাস লেখার জন্য ভারতীয় গবেষকরা এ সকল শাসকের প্রাথমিক জীবন, উত্থান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আফগানিস্তানের ইতিহাস কিছু কিছু উল্লেখ করেছেন। আফগানিস্তানের ইতিহাস না লিখে ভারতের ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়, কারণ ভারতের ইতিহাসের অনেক উৎস নিহিত আছে আফগানিস্তানের মধ্যেই। তাছাড়া আফগানিস্তানের রাজনীতির সাথে ভারতের রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য। কারণ আফগানিস্তানের উত্তর ভাগের সঙ্গে তুর্কিস্তানের, আফগানিস্তানের হিরাত অঞ্চলের সঙ্গে ইরানের, কাবুল জালালাবাদের সঙ্গে ভারতবর্ষ ও বাংলার ইতিহাস বিভিন্ন যুগে মিশেছে বিভিন্নভাবে। ভারতের অনার্যদের হটিয়ে আর্যরা যে স্থান দখল করে নিয়েছিলো সেই আর্যরা মধ্য এশিয়া থেকে আফগানিস্তান হয়েই এসেছিলো ভারতবর্ষে।

২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ভারতবর্ষের উপর একের পর এক বৈদেশিক আক্রমণ শুরু হয়। হিন্দুকুশ পর্বত প্রথম অতিক্রম করে গ্রিকরা। তাঁরা ব্যাকট্রিয়ার একটি রাজ্য স্থাপন করে শাসনকার্য চালিয়েছিলেন।[১০] গ্রিকদের পরে এলেন শকরা। শকদের পাঁচটি শাখা ছিলো। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন স্থানে এ পাঁচটি শাখা শাসনকার্য চালাতেন।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁদের মধ্যে একটি ঘাঁটি গেড়েছিলেন আফগানিস্তানে।[১১] শকদের পৃষ্ঠপোষকতায় কপিশ-গান্ধারে গ্রিক শিল্পরীতি এবং ভারতীয় ভাবধারার সংমিশ্রণে রচিত গান্ধার শিল্পের অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিলো।[১২] শকদের পরে এ অঞ্চলে আসেন পার্থিয়ানরা; পার্থিয়ানদের পরে আসেন কুষাণরা। আফগানিস্তানের অন্তর্গত সুরাখ কোটালে প্রাপ্ত একটি লেখ ও অন্যান্য তথ্য থেকে জানা যায় যে, আফগানিস্তানে কুষাণ মুদ্রা প্রচলিত ছিলো।[১৩]

মধ্য এশিয়া থেকে এসে কুষাণরা প্রথম ব্যাকট্রিয়া অধিকার করেন এবং শকদের ক্ষমতাচ্যুত করেন। ক্রমশ তাঁরা কাবুল উপত্যকার দিকে অগ্রসর হন এবং গান্ধার অধিকার করেন।[১৪] কুষাণদের সময়ে আফগানিস্তান ইরানের অধীনে ছিলো। কুষাণ বংশের দ্বিতীয় রাজা বিম শক ও ইরানি পার্থিয়ানদের হারিয়ে আফগানিস্তান দখল করে নেয়।[১৫] মধ্য এশিয়ার একটি বড় অংশ ইরানের অন্তর্গত, আফগানিস্তানের কিয়দংশ, পাকিস্তান এবং উত্তর ভারত কুষাণরা একই শাসনের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন এবং এরই ফলে নতুন যে সংস্কৃতির জন্ম হল তা স্পর্শ করেছিলো একই সঙ্গে পাঁচটি আধুনিক রাষ্ট্রকে।[১৬]

কুষাণ বংশের বিখ্যাত রাজা কনিষ্কও আফগানিস্তান নিজ দখলে রেখেছিলেন।[১৭] আল বেরুনি আফগানিস্তান এবং মধ্য এশিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলের উপর তার (কনিষ্ক) অধিকার সম্পর্কিত ঐতিহ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। প্রথম সাপুরের 'নকস-ই-রুস্তম' লেখ (আনুমানিক ২৬২ সাল) থেকে জানা যায় যে, সিস্তান বাদে আফগানিস্তানের অধিকাংশ অঞ্চল কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো।[১৮] সুতরাং সে অর্থে কনিষ্ককে আফগান রাজা বললেও অত্যুক্তি হবেনা, কারণ ভারতে কুষাণ বংশের পতনের পরেও আফগানিস্তানে কুষাণরা আরো দু'শো বছর রাজত্ব করেন। সে অর্থে ভারতবর্ষ ও আফগানিস্তানকে বর্তমান পৃথক করে দেখা হলেও এক সময়ে একই ছিলো। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার

Dhaka University Institutional Repository

করলে, আফগানরা বাংলা তথা ভারতের জনগণের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করলেও কখনো এ দুই অঞ্চলের মধ্যে সুসম্পর্কের কমতি ঘটেনি।

চতুর্থ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিক ও ইরানিরা পৃথিবীর উপর আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে লিপ্ত ছিলো। ইতিহাসের জনক হেরোডেটাস ও অন্যান্য গ্রিক লেখকরা ভারতবর্ষকে সম্পদশালী দেশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এ সম্পদই আলেকজাণ্ডারকে ভারত অভিযানে প্রলুব্ধ করে তুলেছিলো। ইরান জয়ের পর আলেকজাণ্ডার এলেন কাবুলে। সেখান থেকে খাইবার হয়ে তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হলেন।[১৯]

আলেকজাণ্ডার ৩৩০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে হিরাত, সিস্তান, আরাকোশিয়া জয় করে কাবুল নদীর দিকে অগ্রসর হন এবং হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে ব্যাকট্রিয়া রাজ্য জয় করেন। আর তাঁর এ বিজয়সমূহই তাঁকে তুর্কিস্তান ও ভারতবর্ষ বিজয়ে উৎসাহিত করেছিলো। পরবর্তীতে এ বিজয়ের ধারাতেই তিনি সমগ্র ভারতীয় ব-দ্বীপ অঞ্চল জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং স্বীয় গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেই ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।[২০]

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্যদের আগমনের পর নানা সূত্র থেকে ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। এ সময়ের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জটিলতা অপেক্ষাকৃত কম। কারণ বিরাট এক অঞ্চলের একক ক্ষমতার সূত্র ছিলো মৌর্য শাসকদের হাতে।[২১] ভারতবর্ষ হতে আলেকজাণ্ডারের প্রস্থানের পর এ অঞ্চলে রাজনৈতিক শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছিলো। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এ অবস্থার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন ও ছোট ছোট রাজ্যগুলোকে মৌর্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। সম্রাট অশোকের পঞ্চম ও ত্রয়োদশ শিলালেখ হতে জানা যায় যে, গান্ধার ও কাবুলের (প্যারোপানিসদয়) নিকটবর্তী অঞ্চল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে ছিলো।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র : ১

মৌর্য যুগে উপমহাদেশ

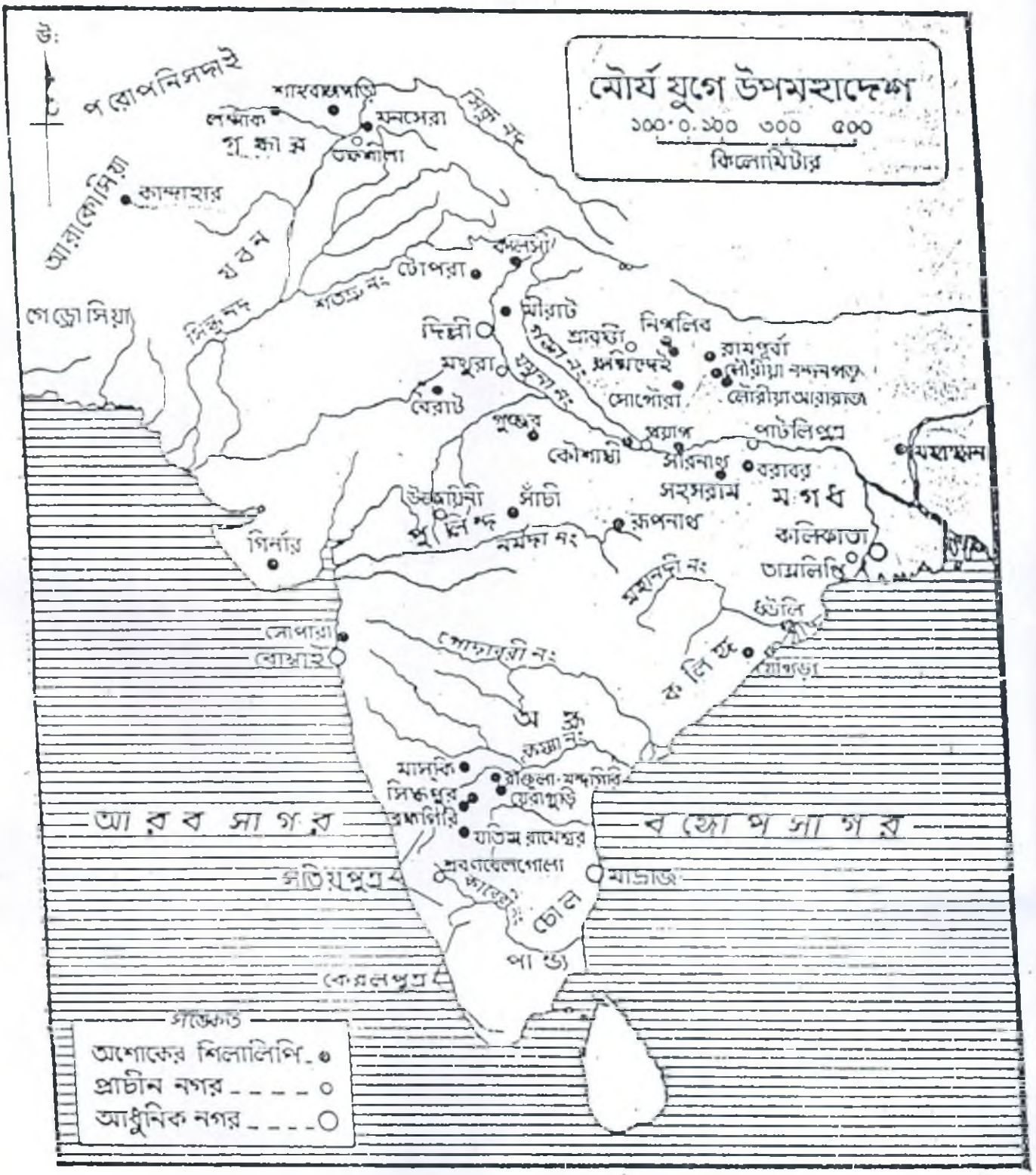

উৎস: রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস, (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

চন্দ্রগুপ্তের সময়ে উত্তর ভারত ষোলটি প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ছিলো।[২৩] এগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলো গান্ধার; যা ভৌগোলিক সীমারেখায় বর্তমানে আফগানিস্তানে অবস্থিত।

মানচিত্র : ২

উত্তর ভারতের ষোলটি প্রধান রাজ্য

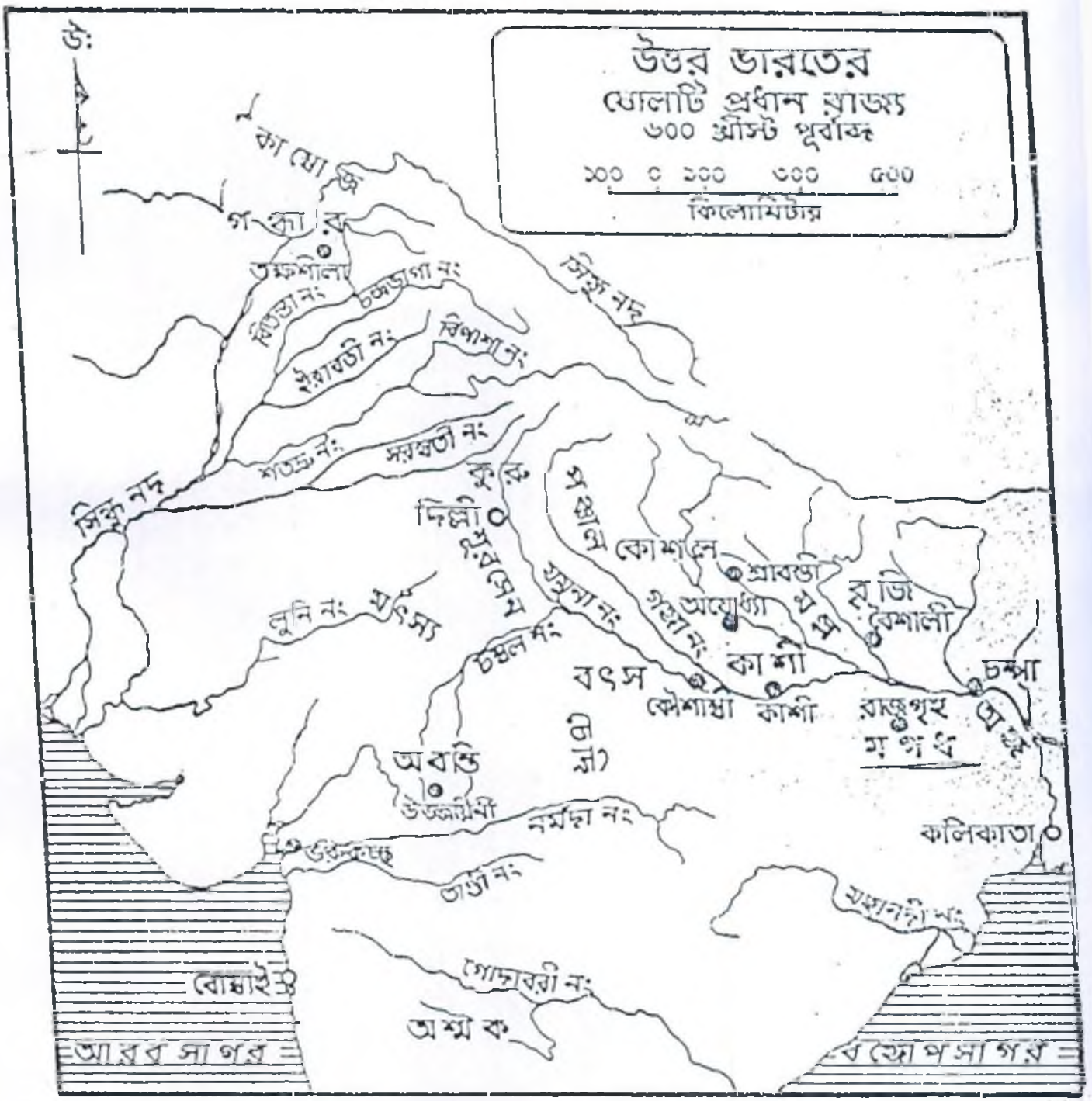

উৎস: রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

নন্দরাজবংশের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে ৩২১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। তিনি তখন মাত্র ২৫ বছরের যুবক। ৩০৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে চন্দ্রগুপ্ত আবার অভিযান শুরু করলেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। সেলুকাস নিকাতরের বিরুদ্ধে তিনি ৩০৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে জয়লাভ করেন। বর্তমানে যেখানে আফগানিস্তান সেই অঞ্চল চন্দ্রগুপ্ত লাভ করেন। চন্দ্রগুপ্ত অধিকৃত ভূখণ্ডের ব্যাপ্তি হল সিন্ধু ও গাঙ্গেয় সমভূমি ও সুদূর উত্তর পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত। যেকোন দেশকালের মাপকাঠিতে এ সাম্রাজ্য বিশাল বলা চলে।[২৪]

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যেই মৌর্যবংশ শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং আফগানিস্তানের প্রায় সমগ্র এলাকাই তাঁদের রাজ্যভুক্ত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দ পর্যন্ত আফগানিস্তান মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। চন্দ্রগুপ্তের পর ২৯২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসার সিংহাসনে বসেন। ২৭২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে বিন্দুসারের মৃত্যুর সময় প্রায় সমগ্র উপমহাদেশেই মৌর্য কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছিলো।[২৫]

বিন্দুসারের পর অশোক সিংহাসনের অধিকারী হলেন। অশোকের সময় বাইরের পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। গ্রিক রাজ্যে অশোক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন যার মাধ্যমে গ্রিকদের মধ্যে ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।[২৬]

বৌদ্ধধর্ম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারত ও আফগানিস্তানের ইতিহাস স্পষ্টরূপ পরিগ্রহ করে। অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মাধ্যন্তিক নামক শ্রমণকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করেন।[২৭] আফগানিস্তানের অনেকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলো এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতের সাথে আফগানিস্তানের যোগসূত্র কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। অশোকই প্রথম ভারতীয় রাজা যিনি শিলালিপির মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে প্রজাদের কাছাকাছি এসেছিলেন। কেবল ভারতীয় উপমহাদেশেই নয়, আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে অশোকের শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে। পল-ই-ডরুন্ত (উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান), লাঘমন উপত্যকা (উত্তর-পূর্ব কাবুল), কান্দাহার (দক্ষিণ-পূর্ব কাবুল) এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল হল এগুলোর প্রাপ্তিস্থান।[২৮]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষে মুসলিম বিজয়ের ধারাক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ে মোহাম্মদ বিন কাসিম ৭১২ সালে প্রথম ভারতের সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম বিজয়ের সূচনা করেন। যদিও মোহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু জয় ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্থায়ী কোনো প্রভাব ফেলেনি তবুও তার বিজয় ভারতে মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব কিছুটা হলেও রেখে যায়। তিনি কিছুকাল পরেই দামেস্কে ফিরে যান।

এদিক থেকে বিচার করলে ভারতের মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় ছিলো গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী। ভারতের মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় পর্যায় একটু ভিন্ন ধাঁচের। কেননা এ পর্যায়ে সুলতান মাহমুদ আসেন আফগানিস্তানের গজনি থেকে। যদিও তাঁর এখানে অবস্থানকাল খুব স্বল্পকালীন। ভারতের ইতিহাসে, রাজনীতিতে তাঁর প্রভাব খুবই কম। কেননা তিনি ভারতের ধনরত্ন নিয়ে গজনিতেই ফিরে গিয়েছিলেন। তাঁর ভারত অভিযানের অন্যতম কারণ ছিলো গজনিকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা। তিনি ১০০১–১০৩০ সাল পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন।

সুলতান মাহমুদের পর দীর্ঘদিন ভারতে কোনো মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়নি। পরবর্তীকালে মুহাম্মদ ঘুরি ১১৯২ সালে ত্বরাইনের ২য় যুদ্ধে চৌহান বংশীয় রাজা পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করে ভারত দখল করেন। উল্লেখ্য, মুহাম্মদ ঘুরিও এসেছিলেন আফগানিস্তান থেকে। তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের ঘুর সাম্রাজ্যের অধিপতি। সুলতান মাহমুদের অভিযানের সাথে তাঁর অভিযানের পার্থক্য হল সুলতান মাহমুদ ভারতে কোনো শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেনি, কিন্তু তিনি গজনিতে ফিরে গেলেও দিল্লিতে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুব উদ্দিন আইবেককে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। কুতুব উদ্দিন আইবেক ছিলেন পরবর্তীকালে দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সুলতান।

গজনির মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘুরির সফল আক্রমণের পর এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিত্রে এক নতুন উপাদানের আবির্ভাব ঘটল। কারণ, তাঁদের আগমনের মাধ্যমে তুর্কি ও

Dhaka University Institutional Repository

আফগানদের শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা হয়। আর এর বৃহত্তর প্রতিক্রিয়া হিসেবে পরবর্তীতে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।[২৯]

তুর্কি ও আফগানরা প্রথমে দিল্লির নিকটস্থ অঞ্চলে নিজেদের রাজ্য বিস্তার করে। কারণ আফগানিস্তান থেকে দিল্লিতে পৌঁছা সহজ ছিলো। চলে আসা তুর্কি, আফগানদের বাঁধা দিয়েছিলো যে চৌহানরা তাদের প্রতিরোধও এসেছিলো দিল্লি অঞ্চল থেকেই। দিল্লির সিংহাসনে তুর্কি-আফগান শাসকদের রাজত্বকালকে দিল্লির সুলতানী আমল বলা হয়। সাধারণত ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমস্ত ইতিহাসকেই সুলতানী আমলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

দিল্লি ছাড়াও তুর্কি-আফগান শাসনের প্রভাব পড়েছিলো গুজরাট, মালোয়া, জৌনপুর, বাংলা ও উত্তর দাক্ষিণাত্যে। এসব অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির উপর ইসলামি সংস্কৃতি সহজেই প্রভাব বিস্তার করেছিলো যার মূল উৎস ছিলো তুর্কো-আফগান সংস্কৃতি।[৩০]

১২০৬ সালে মুহাম্মদ ঘুরির মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি কুতুব উদ্দিন আইবেক ঘোষণা করেন যে, ঘুরির অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলগুলোর তিনিই সুলতান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানের রাজত্ব আর আফগান রাজ্যের প্রদেশ মাত্র রইল না, স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হল।[৩১]

সমসাময়িক সময়ে বাংলা সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেনের অধীনে ছিলো। লক্ষণ সেনের সময়ে বখতিয়ার খলজি নামক একজন সৈনিক দ্বারা বাংলা অধিকৃত হয়। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি এবং পেশায় ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তিনি আফগানিস্তানের গরমশিরের অধিবাসী ছিলেন যা আধুনিক দশত-ই-মার্গ।[৩২] তিনিই হলেন বাংলা বিজয়ী প্রথম মুসলিম সেনাপতি। কেননা, ইতোপূর্বে বাঙলা পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন হিন্দু রাজা কর্তৃক শাসিত হয়েছিলো; কোনো মুসলিম বংশ দ্বারা নয়। অবশ্য তিনি তৎকালীন বাংলার পুরোটাই জয় করেননি; জয় করেছিলেন তার কিয়দংশ মাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

এ ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিলো একজন আফগান সৈনিকের মাধ্যমে। বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্রপাত হয়েছিলো বখতিয়ার খলজির মাধ্যমেই। বখতিয়ার খলজির বাংলা আক্রমণ ও জয়ের মাধ্যমেই বাংলায় মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বখতিয়ার খলজির বংশ পরিচয় সম্পর্কে তেমন জানা যায় না। কথিত আছে যে, বখতিয়ার খলজি ঘোর ও গরমশির রাজ্যের খলজি সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।[৩৩] খলজি সম্প্রদায় সম্পর্কে বেভার্টি যে মূল্যবান তথ্য দিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

"The Khalji are a Turkish tribe, an account of whom will be found in all the histories of the race-The Shajirah-ul-Atrak, Jami-ut-Twarikh, Introduction to the Jafarnama & c; and a portion of them had settled in Garmsir long prior to the period under discussion, from whence they came into Hindustan and entered the service of Sultan Muizz-ut-Din."[৩৪]

বখতিয়ার খলজি একজন কর্মতৎপর, তড়িৎগতি সম্পন্ন, দুঃসাহসী, বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ গোত্র ছেড়ে গজনির দিকে ও সুলতান মুইজ-উদ-দীন এর রাজধানীতে উপস্থিত হন। পরে তিনি গজনি থেকে হিন্দুস্তানে গমন করেন।[৩৫] খলজিগণ মধ্য এশিয়ার সেলজুক সাম্রাজ্যের উপর ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে খোরাসান, সিস্তান ও আফগানিস্তান দখল করেছিলেন। আফগানিস্তানে দীর্ঘদিন বসবাসের পরে তাঁদের মধ্যে আফগান আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি এসে পড়েছিলো। এসব খলজিগণ পরবর্তীকালে আফগান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তাঁর তিনজন সহচর যথাক্রমে আলী মর্দান খলজি, শীরান খলজি ও গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি একের পর এক বাংলায় মুসলিম রাজ্যের ক্ষমতা দখল করেন। ১২০৬ হতে ১২২৭ সাল পর্যন্ত খলজি মালিকদের অধীনে বাংলাদেশের মুসলিম রাজ্যের ইতিহাস অন্তর্বিরোধের ইতিহাস।[৩৬]

Dhaka University Institutional Repository

অপরদিকে ১২০৬ সালে ঘোর রাজ্যের অধিপতি মুইজুদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরি ঝিলাম নদী তীরে আততায়ী কর্তৃক নিহত হন। ভারতে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালেই বাংলা এবং ভারতে এ দু'জনের মৃত্যু যেন এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করল। কেননা এ নির্মম ধারাই বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুসলিম ইতিহাসে সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করে। ১২০৬ হতে ১২২৭ সাল পর্যন্ত মোট তিনজন আফগান খলজি আমীর বাংলা শাসন করেন।

বাংলার ভাগ্যাকাশে দুষ্টগ্রহের মতোই আবির্ভাব ঘটে আলী মর্দান খলজির। আলী মর্দান খলজির উৎসাহ এবং অনুপ্রেরণায়ই কুতুব উদ্দিন আইবেক বাংলার প্রতি দৃষ্টি দেন; যা ছিলো বাংলার স্বাধীন শাসনের জন্য একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া।

আলী মর্দান সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো তিনি ছিলেন তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান। তিনি ছিলেন বখতিয়ার খলজির অনুচর ও বঙ্গ বিজয়ী সৈনিক হিসেবে বখতিয়ার খলজির সাথে বাংলায় আসেন। আলী মর্দান খলজির সময়ে বাংলা, দিল্লি ও গজনির ইতিহাসে শুরু হয় নতুন ক্ষমতার লড়াই। কেননা ১২৩৮ সালের মধ্যভাগে আফগানিস্তানের গজনি অঞ্চলের মালিক তাজউদ্দিন ইয়ালদুজ পাঞ্জাব আক্রমণ করলে কুতুব উদ্দিন আইবক বাংলার অধিপতি আলী মর্দান খলজিকে নিয়ে আফগানিস্তানের গজনিতে যান। কিন্তু আফগানিস্তানের গজনিতে কুতুব উদ্দিনের শাসন মাত্র ৪০ দিন স্থায়ী হয়। কেননা তিনি তাজউদ্দিনের চক্রান্তে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। কিন্তু আলী মর্দান খলজি আফগানদের হাতে বন্দি হন। আলী মর্দান নিজ জ্ঞানে, কূটনৈতিক চালে তাজউদ্দিনের সভাসদের মর্যাদা লাভ করেন। অল্পকাল পরে তিনি গজনির শাসনকর্তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলে তিনি গজনি থেকে বিতাড়িত হন ও পুনরায় বাংলার ব্যাপারে মনোযোগ দেন। বাংলা, দিল্লি ও গজনির ইতিহাসে এ সময় যেটা লক্ষ্যনীয় সেটা হল এই আফগানরাই নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যাপৃত থাকেন, পার্থক্য শুধু স্থান ভেদে, কারণ এরা কেউ দিল্লির, কেউ গজনি আর কেউ ছিলো বাংলার অধিপতি।

Dhaka University Institutional Repository

হুসামউদ্দিন ইওজ খলজি 'সুলতান গিয়াস উদ্দিন' উপাধি ধারণ করে পুনরায় বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন। বখতিয়ার খলজির মতো তিনিও ছিলেন বিত্তহীন ভাগ্যান্বেষী সৈনিক। তিনি ছিলেন বখতিয়ার খলজির এলাকারই বাসিন্দা অর্থাৎ তিনিও ছিলেন আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী। সুলতান মুহাম্মদ ঘুরি কর্তৃক দিল্লি বিজয়ের পর তিনি বখতিয়ার খলজির সঙ্গে বাংলায় আসেন এবং ১২২৭ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতবর্ষের দিল্লি এবং বাংলায় এ সময় ছিলো মূলত পাঠানযুগ। আর এই পাঠানযুগের শাসকরা ছিলেন দুর্ধর্ষ তুর্কো, আফগান, খলজি।

১২২৭ সালে দিল্লির সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিশের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদ লখনৌতির শাসক গিয়াস উদ-দীন ইওজ খলজিকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলা জয় করেন এবং বাংলায় খলজি শাসনের অবসান ঘটে। খলজি শাসনামলে বাংলা স্বাধীন থাকলেও নাসির-উদ-দীন মাহমুদের বাংলা জয়ের মাধ্যমে বাংলা মোটামুটি দিল্লির অধীনে একটি প্রদেশে পরিণত হয় এবং এ ধারা অব্যাহত থাকে দিল্লির সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বলবনের মৃত্যু পর্যন্ত অর্থাৎ ১২৮৭ সাল পর্যন্ত। তবে এ সময়কালের মধ্যে বাংলায় কোনো কোনো গভর্নর স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেও তাঁদের স্বাধীনতা কখনো স্থায়ী রূপ লাভ করেনি।[৩৭]

ইলতুৎমিশের জীবিতাবস্থায় তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন মাহমুদ মারা গেলে খলজি বংশোদ্ভূত মালিক বলাকা খলজি মতান্তরে মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন বলাকা খলজি[৩৮] সাময়িকভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা[৩৯] করলে ইলতুৎমিশ ১২২৯-৩০ সালে বাংলায় অভিযান পরিচালনা করে তাঁকে পরাজিত করেন।[৪০] তিনি আলাউদ্দিন জানিকে বাংলার শাসনভার দেন। বলাকা খলজি ছিলো খলজি আফগান।[৪১] ইলতুৎমিশের নিয়োগকৃত আলাউদ্দিন জানি ছিলো তুর্কো-আফগান। আলাউদ্দিন জানির পর সাইফুদ্দিন আইবেক লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি জাতিতে তুর্কি ছিলেন।[৪২] সাইফুদ্দিন আইবেকের মৃত্যুর পর তুগরল তুগান খান লখনৌতির শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনিও জাতিতে তুর্কি ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইলতুৎমিশ এদেরকে দেহরক্ষী হিসেবে ক্রয় করেছিলেন। তুগান খানের পরে সইফুদ্দিন আইবেকের জামাতা তমর খান লখনৌতির গভর্ণর ছিলেন। তমর খানের পরে বাংলার শাসনকর্তার নাম জানা যায় না। এমনকি তবকাত-ই-নাসিরীতেও মিনহাজ-উস- সিরাজ এ সম্পর্কে উল্লেখ করেননি।[৪৩] তবে এ সময়ে দিনাজপুরের গঙ্গারামে প্রাপ্ত শিলালিপিতে জালালুদ্দিন মাসুদ জানির নাম পাওয়া গেছে এবং এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এ সময়ে তিনি হয়ত বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি আলাউদ্দিন জানির পুত্র ছিলেন। এরপর ১২৮৭ সাল পর্যন্ত ইখতিয়ার উদ্দিন ইউজবক আরলখান বা মুগীস উদ্দিন ইউজবক, জালালুদ্দিন মাসুদ জানি (দ্বিতীয় বার) ও ইজুদ্দীন বলবন ইউজবকী, তাজউদ্দিন সনজর ওসলান খান ও তাতার খান বাংলার গভর্ণর ছিলেন।[৪৪]

মুহাম্মদ ঘুরি দিল্লি জয় করে গজনিতে প্রত্যাবর্তনকালে তাঁর অনুচর কুতুব উদ্দিন আইবেককে দিল্লিতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে রেখে যান। কুতুব উদ্দিন আইবেক জাতিতে তুর্কো-আফগান। ইলতুৎমিশ কুতুব উদ্দিন আইবেকের বন্দেগানী চেহেলগান গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং তিনি কুতুব উদ্দিন আইবেকের একই গোত্রভুক্ত বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। এক্ষেত্রে নাসির উদ্দিন মাহমুদ ইলতুৎমিশের পুত্র বলে তিনি বাংলায় ১২৮৭ সাল পর্যন্ত দিল্লির অধীনস্থ যে শাসন প্রতিষ্ঠা করেন তা এক অর্থে তুর্কো আফগান শাসনই ছিলো।

১২৮৭ সালে বলবনের মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র বুগরাখান বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বুগরা খানের পিতা গিয়াস উদ্দিন বলবন সুলতান শামসুদ্দীনের মুক্তিপ্রাপ্ত চল্লিশজন তুর্কি গোলামের অন্যতম ছিলেন।[৪৫] বুগরা খানের বাংলায় শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার মাধ্যমে বাংলায় বলবনি বংশের শাসন শুরু হয় এবং দিল্লিতে বিশৃঙ্খলার সুযোগে বলবনি শাসনের অবসান হয়ে খলজি শাসনের সূচনা হয়। বুগরা খানের মাধ্যমে বাংলায় স্বাধীন শাসনের সূচনা হয়।[৪৬] দিল্লির খলজিদের শাসনামলে বাংলা মোটামুটি স্বাধীন ছিলো।[৪৭] পরে দিল্লির তুঘলক শাসনামলে যদিও তুঘলকরা বাংলায় হস্তক্ষেপ করে কিন্তু তুঘলক শাসনামলেই অর্থাৎ ১৩৩৮ সালে বাংলা পুরোপুরি স্বাধীন হয়ে যায় এবং এ

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা প্রায় দুইশত বছর স্থায়ী হয়। ১৩৩৮ সালে ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হবার সাথে সাথে বাংলায় পাঠান শাসনের অবসান ঘটে।

শেরশাহ শুরের বাংলায় আগমনের মধ্য দিয়ে বাংলায় আফগান শাসনের গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা হয়। যদিও শেরশাহ শুরের পূর্বে বাংলা তথা ভারতের যে তুর্কি বীর, খলজি আমীরগণ, গজনি অধিপতিরা শাসন করেছেন অনেক ঐতিহাসিক তাঁদের সময়কালকে পাঠান বা আফগান বলতে নারাজ। কেননা তাঁরা মনে করেন যে, তাঁরা তুর্কো বংশোদ্ভূত। কিন্তু এক অর্থে তাঁদেরকে আফগান বলা যুক্তিযুক্ত; কারণ তাঁদের পুর্বপুরুষেরা তুর্কি বংশোদ্ভূত হলেও আফগানিস্তানের মাটির সাথে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছিলেন। তাঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন আফগান ভূমিতেই। আব্বাসীয় খলিফাদের দুর্বলতার সুযোগে মুসলিম সাম্রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ রকম ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি রাজ্য অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং আফগানিস্তানের গজনি যার রাজধানী হয়। গজনির তুর্কি সুলতানরাই ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলমান অভিযানের নায়ক।

সুলতান মাহমুদ জাতিতে তুর্কি হলেও তিনি ছিলেন আফগানিস্তানের গজনির অধিপতি। গজনি ছিলো তাঁর নিজ সাম্রাজ্য এবং সেখান থেকে তিনি ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন ও প্রাপ্ত ধন-সম্পদ দিয়ে গজনিকেই সমৃদ্ধিশালী করেন। ভারত বিজেতা সুলতান-ই-গাজী মুইজ-উদ-দীন মোহাম্মদ সাম বা মুহাম্মদ বিন ঘুরির জীবনালেখ্য বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, তিনি ভারতে আসেন গজনির ঘুর সাম্রাজ্য থেকেই। তিনি ছিলেন গজনি অধিপতি।[৪৮] গজনি আজও আফগানিস্তানের অংশ হিসেবেই পরিচিত। মুহাম্মদ বিন ঘুরি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন গজনিতেই এবং জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি গজনিতেই ছিলেন। যদিও মুহাম্মদ ঘুরির পূর্বপুরুষেরা তুর্কি ক্রীতদাস ছিলেন কিন্তু তাঁকে আফগান বলা অযৌক্তিক হবে না। কারণ তিনি আফগানিস্তান থেকেই ভারত আক্রমণ করেন। মুহাম্মদ ঘুরির প্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন আইবেক ছিলেন সুলতানী আমলের প্রথম স্বাধীন সুলতান। তিনিও ছিলেন জাতিতে তুর্কি। তিনি যখন যৌবনে

Dhaka University Institutional Repository

পদার্পন করেন, বণিকরা তখন তাঁকে গজনির রাজদরবারে নিয়ে আসেন এবং মুহাম্মদ বিন ঘুরি তাঁকে বণিকদের কাছ থেকে কিনে নেন।[৪৯]

ঈশ্বরী প্রাসাদ বলেন, Originally Aibek was a slave. He was purchased by the Qazi at Nishapur, through whose favour he acquired a reputation for courage and manly bearing. After the Qazi's death he passed into the hands of sultan Muz-ud-din.[৫০] নদীয়া বিজেতা বখতিয়ার খলজিকে[৫১] যদিও তুর্কি বীর বলে অভিহিত করা হয় তথাপি তিনিও ছিলেন আফগানিস্তানের ঘোর ও গরমশিরের[৫২] অধিবাসী। গরমশির বর্তমানে আফগানিস্তানের দস্ত-ই-মার্গ নামে পরিচিত। তাই, যদিও শেরশাহ থেকে প্রকৃতপক্ষে বাংলা তথা ভারতে আফগান শাসন প্রতিষ্ঠা হয় কিন্তু তাঁর পূর্ববর্তী শাসকেরাও আফগান ছিলো।

শেরশাহের আবির্ভাবের পূর্বে কিছুকাল বাংলা তথা ভারতে আফগান শাসন স্তিমিত হয়ে পড়ে। শেরশাহের আবির্ভাবের মাধ্যমে বাংলায় আফগান শাসন পুনর্জীবন লাভ করে। শেরশাহ ছিলেন পুরোপুরিভাবেই আফগান বংশোদ্ভুত। তাঁর পিতা হাসান শুর ছিলেন আফগান বংশোদ্ভুত এবং শাসারামের জায়গীরদার। তাঁরা ছিলেন আফগান জাতির শুর উপদল প্রসূত।

পঞ্চদশ শতকে হঠাৎ করে রাজকীয় শক্তি হিসেবে আফগানদের উত্থান, ষোড়শ শতকে মুঘলদের উপর আধিপত্য বিস্তার এবং পরবর্তীতে ভারতের পূর্বাঞ্চলে তাঁদের শক্তিশালী পদচারণা ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর অধ্যায়ের সূচনা করে।[৫৩] ১৫২৬ সালে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। শেরশাহ তাঁর পিতার মৃত্যুর পর শাসারাম থেকে আগ্রায় আসেন এবং বাবরের অধীনে চাকরি নেন। এ সম্পর্কে জহিরুদ্দিন মুহাম্মদ বাবর তাঁর আত্মজীবনী বাবরনামায় বলেছেন, "শের খান শুর যাকে আমি অনেক অনুগ্রহের পরিচয় দিয়েছি, কয়েকটা পরগানা দান করেছি।[৫৪] তিনি বাবরের সহায়তায় পুনরায় শাসারামে

Dhaka University Institutional Repository

জায়গীর প্রাপ্ত হন। ক্রমান্বয়ে তিনি বিহারের অধিপতি হন এবং চুনার অধিপতি তাজ খান এর বিধবা পত্নী মালিকাকে বিয়ে করে চুনার দুর্গটি লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বাবরের জীবনের শেষ দিনগুলোতে এবং ১৫৩০ সালে বাবরের মৃত্যুর পর শেরশাহ বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ুনের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। শেরশাহ অদূরদর্শি হুমায়ুনকে সহজেই পরাজিত করে বাংলার অধিপতি হন। এভাবে মুঘল শাসনের শুরুতেই (১৫৩০) বাংলায় আফগান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুঘলদের আধিপত্য খর্ব হয়। এরই ধারাবাহিকতায় আকবরের বাংলা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ আফগান শাসন অটুট থাকে।

১৫৩৮ সালের ৬ এপ্রিল শেরখান গৌড় জয় করেন; সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা লোপ পায় এবং বাংলাদেশ আফগানদের অধিকারে চলে যায়। ১৫৩৮ হতে ১৫৭৬ সালে আকবরের বাংলা জয় পর্যন্ত আটত্রিশ বছর বাংলার ইতিহাস আফগান শাসনেরই ইতিহাস। এ সময়ে প্রথমে শেরখান ও তাঁর বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশ দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে শাসিত হয়, কিন্তু পরে পর্যায়ক্রমে প্রথমে শুর ও পরে কররানী সুলতানরা স্বাধীনভাবে বাংলাদেশ শাসন করেন।[৫৫]

আফগান বংশোদ্ভূত শেরশাহের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসে যে আফগান শাসনের সূত্রপাত হয় তার প্রথম শাসক শেরশাহ এবং শেষ শাসক দাউদ কররানী। এ সময়ে তিনটি আফগান বংশ একাদিক্রমে বাংলা শাসন করেছিলো। এগুলো হলো: শেরশাহের শুরি বংশ, মুহাম্মদ শাহী বংশ এবং কররানী বংশ। এই আফগান শক্তি প্রায় ৩৭ বছর মুঘল শক্তিকে প্রতিহত করেছিলো এবং দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করেছিলো। শেরশাহ প্রথমে মুঘল শক্তিকে পর্যুদস্ত করে বাংলার অধিপতি হন ও পরে কনৌজের যুদ্ধে (১৫৪০) হুমায়ুনকে পরাজিত করে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ফলে বাংলাদেশ দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।[৫৬] শেরশাহ ভারতবর্ষের সম্রাট হলেন[৫৭] এবং তাঁর রাজধানী স্থাপিত হল দিল্লিতে। এভাবে দেখা যায় যে, বাংলায় আফগান বীর শেরশাহের মাধ্যমে যে নতুন ক্ষমতার, নতুন বংশের যাত্রা শুরু হয় তা একসময় সমগ্র ভারতকে গ্রাস করে, জয় করে আফগানরা নিজেদের চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

ও বাহুবলে। কিন্তু পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ১৫৪৫ সালে শেরশাহ কালিঞ্জর দুর্গ জয় করতে গিয়ে অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করলেন।

শের আফগান শেরশাহের এ স্বল্পকালীন শাসনামল ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছিলো। মনে করা হয় যে, শের শাহের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে পরবর্তীকালে মুঘলরাও অনুসরণ করেছে। যেমন-আকবর বাংলাকে মোট ১৯টি সরকারে[৫৮] বিভক্ত করেছিলেন; যা ছিলো শেরশাহের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অনুকরণে করা। শেরশাহ প্রথম ভারতবর্ষে ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেছিলেন। তিনি যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করেছিলেন যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।[৫৯] আকবর ভূমি ব্যবস্থায় যে সংস্কার করেছিলেন তা শেরশাহের আদলেই। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় শের শাহের শাসনামল স্বল্পকালীন হলেও ভারত ও বাংলায় তিনি যে নতুন গতি, নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন তা তিনি পরবর্তী শাসক এমনকি মুঘলদের মাঝেও রেখে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত শেরশাহের সময় থেকেই যে আফগান মুঘল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়, তা বহু বছর ধরে চলতে থাকে। শেরশাহের পর দিল্লির উপর আফগানদের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না থাকলেও বাংলায় তাঁর বংশধররা ৩৭ বছর শাসন করেন। শেরশাহের পর আমরা দিল্লির ইতিহাসে কিছুদিনের জন্য হুমায়ুন ও পরে আকবরকে দেখতে পাই তবে এ সময় বাংলা মোটামুটি স্বাধীন ছিলো। মূলত আমরা এ সময় ভারতবর্ষের ইতিহাসে দু'টি শক্তি দেখতে পাই। একটি আফগান শক্তি এবং অপরটি মুঘল শক্তি।

শেরশাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান শুর ইসলাম শাহ নাম নিয়ে বাংলার সুলতান হন এবং নয় বছর রাজত্ব করেন (১৫৪৫-১৫৫৪)। ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্র ফিরোজ শাহ আমীরদের সম্মতিক্রমে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র তিনদিন রাজত্ব করার পরেই শেরশাহের ভ্রাতুস্পুত্র ও ইসলাম শাহের শ্যালক মুবারিজ খান কর্তৃক নিহত হন। মুবারিজ খান মুহাম্মদ শাহ আদিল নামধারণ করে সিংহাসনারোহন করেন। কিন্তু দুর্বল আদিল শাহ সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যর্থ হন। শেরশাহ ও ইসলাম শাহের অকাল মৃত্যুর ফলেই আফগান শক্তি অনেকটা ছত্রছাড়া হয়ে যায়।

এ সময় আফগানরা নিজেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। ১৫৫৪ সালে বাংলায় আফগান শাসনকর্তা হন মুহাম্মদ খান শুর। তিনি দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে বাংলার স্বাধীন সুলতান হন। কিন্তু মুহাম্মদ আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমু তাঁকে ছাপরঘাটার যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন (১৫৫৫ সাল)। এরপর মুহাম্মদ শাহ আদিল জনৈক শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু শামসউদ্দিন মোহাম্মদ শাহ এর পুত্র খিজির খান গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে নিজেকে বাংলার সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। ইতোমধ্যে হুমায়ুন আফগান নায়ক সিকান্দার শাহ শুরকে পরাস্ত করে দিল্লি ও পাঞ্জাব পুনরুদ্ধার করলেন। কিন্তু এর কিছুকাল পরে ১৫৬৬ সালে তিনি মারা যান। এর দশ মাস পরে হুমায়ুনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বালক আকবর ও তাঁর অভিভাবক বৈরাম খানের সঙ্গে মুহাম্মদ শাহ আদিলের হিন্দু সেনাপতি হিমুর পানিপথ প্রান্তরে যে সংঘর্ষ হয় তাতে হিমু নিহত হন। ইতোমধ্যেই বাহাদুর শাহ বাংলা পুনরাধিকার করেন ও আদিল শাহকে পরাজিত করেন। তিনি আরো অগ্রসর হলে মুঘল সেনাপতি খান-ই-জমান কর্তৃক পরাজিত হন।

এ সময়কাল অর্থাৎ মুহাম্মদ শাহী বংশের শাসনামল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এটি ছিলো আফগান-মুঘল সংঘর্ষের একটি চূড়ান্ত পর্ব। কেননা এ সময় দেখা যায় যে, বাংলা ও ভারতবর্ষের অধিকার নিয়ে আফগান-মুঘল সংঘর্ষ ছিলো প্রতিনিয়ত। এর অব্যবহিত পরেই বাংলায় কররানী আফগানদের শাসন শুরু হয়। কররানী আফগানদের প্রথম শাসক তাজখান কররানী ছিলেন মুহাম্মদ শাহী বংশের শেষ শাসক গিয়াসউদ্দিনের কর্মচারী। গিয়াস উদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা গিয়াস উদ্দিন জালাল শাহ নাম ধারণ করে সুলতান হলেন এবং তাঁকে হত্যা করে তাজখান কররানী বাংলার অধিপতি হন ও কররানী বংশের সূত্রপাত করেন। ১৫৬৬ সালে তাজখান মারা যান এবং সুলেমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন কররানী বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

উড়িষ্যা জয় করেন। তাঁর রাজ্যসীমা দক্ষিণে জুরি, পশ্চিমে কোনো নদ ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

শুরি বংশের বিভিন্ন শাখা বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে বিভিন্ন এলাকা মুঘলদের দখলে যাওয়ায় হতবিহ্বল আফগান নায়কদের অধিকাংশই সুলেমান কররানীর মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিলেন। তিনি সামরিক শক্তিতে অপরাজেয় হয়েছিলেন। তিনি মুঘলদের সাথে বন্ধুত্বের নীতি অনুসরণ করেছিলেন। সুলেমানের পরবর্তী শাসক ছিলেন বায়েজিদ কররানী। বায়েজিদ কররানীর পর ক্ষমতায় আসেন দাউদ কররানী। তিনিই কররানী বংশের শেষ শাসক। দাউদ কররানীর সময়েই আকবরের অধীনে মুঘল সেনাপতি মুনিম খান ও মানসিংহ বাংলা জয় করেন। ১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানীর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলায় আফগান শাসনের অবসান ঘটে ও পুরো বাংলা মুঘল শাসক আকবরের অধীনে দিল্লির কর্তৃত্বে আসে। ১৫৭৬ সালে দাউদের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার ইতিহাসে আফগান পর্ব সমাপ্ত হয়। অবশ্য দাউদের মৃত্যুর পরেও বাংলার কোনো কোনো অংশে আফগান নায়কেরা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। তাঁদের সম্পূর্ণভাবে দমন বা বশীভূত করতে মুঘল শক্তির অনেক সময় লেগেছিলো।[৬০]

সম্রাট আকবরের বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে বাংলায় আফগানদের আধিপত্য রাজনৈতিকভাবে খর্ব হলেও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক টিকে থাকে প্রায় শতাব্দীকাল। বাংলার কররানী বংশের পতনের পর আফগানরা বাংলা থেকে বিদায় নেবার সাথে সাথে মুঘল শক্তি বাংলায় প্রবেশ করে। মুঘল সম্রাট আকবরের বাংলায় প্রবেশের মাধ্যমে এ অঞ্চলে মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও মুঘল শক্তির গোড়াপত্তন হয় তাঁর পিতামহ বাবরের মাধ্যমে। এখানে উল্লেখ্য, ভারতে মুঘল বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর এসেছিলেন মধ্য এশিয়ার ফারগানা রাজ্য থেকে।

বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, জুমাদা মাসের পয়লা তারিখে আমরা কাবুল থেকে হিন্দুস্তান অভিযানে যাত্রা করলাম। আমরা ছোট কাবুলের পথে চললাম।[৬১] বাবরের শরীরে দুই বিখ্যাত বীর তৈমুর লঙ ও চেঙ্গিস খানের রক্ত প্রবাহিত। মোঙ্গল

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ থেকেই মুঘল শব্দটির উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে নিজেকে তুর্কি বংশোদ্ভূত বলে পরিচয় দিয়েছেন। এ তুর্কি বীর পিতার রাজ্য ফারগানা থেকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে আফগান বংশোদ্ভূত ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে ভারতবর্ষে মুঘল শক্তির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর বিজিত অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমারেখার মাধ্যমে ভারত ও আফগানিস্তান একাকার হয়ে যায়। কেননা বাবরের বিজিত রাজ্যের মধ্যেই কাবুল কান্দাহার রয়ে যায় এবং তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণও কাবুল কান্দাহারকে নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হন। এতে দেখা যায় যে, মুঘলদের ভারত জয়ের মাধ্যমে আফগান আধিপত্য প্রত্যক্ষভাবে খর্ব হলেও পরোক্ষভাবে মুঘলরা আফগান ও ভারতবর্ষকে ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরো বেশি নিকটতর করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে তাঁদের এ সম্পর্ক দীর্ঘদিন টিকে থাকে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে।

রাজমহলের যুদ্ধে আফগান শক্তির পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারত থেকে আফগানদের বিদায় হলে পরবর্তীকালে আফগানরা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (১৭৬১) এর কথা উল্লেখ করা যায়। কেননা এ যুদ্ধে একপক্ষে ছিলো ভারতের মারাঠা শক্তি ও অপরপক্ষে ছিলো আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালী।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর বাংলায় যে ইংরেজ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে পরবর্তীতে সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিই সমগ্র ভারতবর্ষকে গ্রাস করে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর সমগ্র ভারত সরাসরি ব্রিটেনের অধীনে চলে যায়। যেহেতু আফগানিস্তানের কাবুল কান্দাহার ভারতের অধীনে ছিলো তাই এ অঞ্চলেও ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন প্রতিষ্ঠার পর মিশনারীদের দ্বারা খ্রিস্টধর্ম প্রচারের চেষ্টা করে। এছাড়া তারা তাদের শাসনের সুবিধার্থে এদেশে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো ভারতবাসীদের মতো আফগানরাও ইংরেজ শাসন, ইংরেজি ভাষা ও

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেনি। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলী উল্লেখ করেন, "ইংরেজ এবং অন্য হরেক রকম সাদা বুলবুলিকে আফগান পছন্দ করে না। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের পাণ্ডিত্যাম্বরে উপস্থিত যে কয়টি পক্ষী উড্ডীয়মান, তাদের সর্বাগ্রে শ্বেতকৃষ্ট, এখানে তাদের প্রবেশ নিষেধ।"[৬২]

কাবুল কান্দাহার ছাড়া আফগানিস্তানের বাকি অংশ আফগানদের দ্বারা শাসিত হতো। এ সকল অঞ্চলে কখনো ইংরেজরা কখনো রাশিয়ানরা প্রভাব বলয় বিস্তারের চেষ্টা করেছে। সব সময়ই আফগান জনমনে ইংরেজদের শাসন ও সংস্কৃতিতে বিরোধীতা করার কারণে আফগানিস্তানে ইংরেজদের প্রভাব স্থায়ী হয়নি।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শেষার্ধে যে খিলাফত আন্দোলন (১৯২০) হয় তাতেও আফগানদের সংশ্লিষ্টতা ছিলো। ভারতের জনগণের মতো আফগান মুসলমানরাও মনে করতো খিলাফত নামক প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকা দরকার। তুরস্কে খিলাফত টিকিয়ে রাখার জন্য তাই আফগান মুসলমান ও ভারতীয় মুসলমান নেতারা সমবেত হয়ে তুরস্কে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু এরই মধ্যে ১৯২৪ সালে তুরস্কের খিলাফত বিলুপ্ত হলে তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২০ সালের দ্বিতীয়াংশে মওলানা আবদুল বারী, মওলানা শওকত আলী ও মওলানা আবুল কালাম আযাদ ভারতকে "দারুল হরব" বলে ঘোষণা করেন এবং ভারতীয় মুসলমানদেরকে ধর্মীয় কর্তব্যের ডাকে "দারুল ইসলাম" এ হিজরত করার উপদেশ দেন। এ ব্যাপারে মওলানা আবুল কালাম আযাদ মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি একটি ফতোয়া প্রচার করে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গিতে হিজরতের যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং ধর্মীয় কর্তব্যের ডাকে মুসলমানদেরকে ভারত ত্যাগের পরামর্শ দেন। তিনি তাঁর ফতোয়ায় পুলিশ এবং সেনাবিভাগের চাকরিও বর্জন করতে বলেন। আফগানিস্তানের আমীর আমানুল্লাহ খান তাঁদেরকে আশ্রয় দিবেন এবং এ আশ্বাসের ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষত সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে হাজার হাজার মুসলমান দেশ ত্যাগ করে; অনেক ক্ষেত্রে ভিটা-মাটি বিক্রি করে

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানের সীমান্তে গিয়ে জমায়েত হয়। ১৯২০ সালের আগস্টে আফগান সীমান্তে আঠারো হাজার মুহাজির আশ্রয় প্রার্থী হয়।[৬৩]

বাংলার বাইরে অনেক রাজবংশের পরাক্রান্ত রাজারা লোক-লস্কর নিয়ে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেছে। তাদের একাংশ হয়ত স্থায়ীভাবে এদেশে থেকে গেছে। এদেশের জনসমুদ্রে কবে, কোথায় তারা তলিয়ে গেছে তার কোনো হিসেব নেই। পুরনো পুঁথির পাতায় শুধু নাম হয়ে তারা বেঁচে আছে। যেমন– মালব, হুন, কম্বোজ, শকদ্বীপি প্রভৃতি।

এছাড়াও ভিন্ন প্রদেশ থেকে কয়েকটি রাজবংশ এসে বাংলার বিভিন্ন অংশে পুরুষানুক্রমে বসবাস করে রাজত্ব করলেও বাংলার জনপ্রবাহে তারা কোনো ছাপ রেখে যেতে পারেনি। তুর্কি বিজয়ের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশে এ রকমের তিন-চারটি প্রধান প্রধান রাজবংশের সন্ধান মেলে। যেমন-দশম শতকে কম্বোজ নামে এক রাজবংশ গৌড়ে কিছুদিন রাজত্ব করেছিলো। তুর্কি বিজয়ের পরও বাংলাদেশে এ ধরনের শীর্ণ ও ক্ষীণ রক্তধারায় কিছু কিছু ছোঁয়াচ লেগেছে। শত শত বছর ধরে একত্রে বসবাস করার ফলে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে তারা এক হয়ে গেছে। এমনি অবিচ্ছিন্ন ধারায় শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাংলাদেশে বিভিন্ন জন মিলেমিশে একাকার হয়ে কালক্রমে বাঙালি জাতির সৃষ্টি করেছে।[৬৪]

মুসলমান বহিরাগতদের মধ্যে আফগান তুর্কি ও হাবশিদের অধিকাংশ মুঘল পূর্ব যুগে এখানে বসতি স্থাপন করে। পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের নিকট আফগানদের পরাজয়ের পর দলে দলে আফগানরা বাংলাদেশে বসতি স্থাপন করে।[৬৫]

বাংলার বহিরাগত মুসলমানদের মধ্যে তুর্কি আফগানরা একটি প্রধান অংশ। প্রায় দু'শো বছরকাল তারা বাংলা শাসন করেছিলো। কালানুক্রমে তুর্কিরা বাংলার অন্যান্য মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বাংলাদেশে বহু সংখ্যক তুর্কি আফগান নামের অস্তিত্ব প্রথম যুগের তুর্কি আফগান বসতি স্থাপনকারীদের সাক্ষ্য বহন করে। বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

বহু পরিবার আছে–যাদের পারিবারিক নাম গজনভি, বখতার (বখতিয়ার) অনুরূপ নাম ও উপাধি যেমন আল তামাস, তুঘলক প্রভৃতি রয়েছে।

বহু আফগান বাংলার তুর্কি শাসকদের অধীনে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসেবে কাজ করেছিলো। তারা প্রায় সকলেই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। বাংলাদেশ শাসনকালে বহু সংখ্যক আফগান এদেশকে স্বদেশ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলো।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা যখন মুঘলদের হস্তগত হয় তখন রাজ্যচ্যুত বহু সংখ্যক আফগান বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকে বাংলার বার ভূঁইয়াদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করে। এ আফগানদের অনেকে উসমান লোহানী ও বায়েজিদ কররানীর নেতৃত্বে সিলেটে ও ময়মনসিংহের কিয়দংশে জমিদারি স্থাপন করে এবং এক পুরুষকাল মুঘল শাসনের বিরোধিতা করে। তাদের পরাজয় ঘটে ১৬১১ সালে দৌলাম্বপুরের যুদ্ধে।

এ ভাগ্য বিপর্যয়ের পর আফগানরা শ্রীহর্ম, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। আফগানরা এমন একশ্রেণীর জাতি যারা স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে চলতে গর্ববোধ করে। কিন্তু বাংলাদেশে আফগান বহিরাগত অন্যান্য মুসলমান অধিবাসীদের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হয়ে গেছে। অবশ্য এদের কিছু সংখ্যক বংশধর বিশেষ করে উত্তর বঙ্গে আজও তাদের সামাজিক বৈশিষ্ট্যের কিছু চিহ্ন বহন করছে। বাংলাদেশে এমন অনেক পরিবার আছে যারা আফগান গোত্রের নিদর্শন সূচক পদবী লোদী লোহানী, শুর, পন্নি, পাঠান এবং খান বহন করছে।[৬৬]

সাংস্কৃতিক যোগসূত্র

শুধু রাজনীতিতে নয়, বাংলার শিল্প-সাহিত্য, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান রয়েছে। বাংলা সাহিত্যের কালপর্বকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। প্রাচীনযুগে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যম ছিলো সংস্কৃত ভাষা এবং সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিলো দেবদেবী নির্ভর।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আরবি, ফারসি, তুর্কি প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।

বাংলা সাহিত্যের এ মধ্যযুগের সূচনা হয় মূলত মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমে। আর এ মধ্যযুগে সাহিত্য হয়ে ওঠে জীবন নির্ভর যাতে বিষয়বস্তু হিসেবে দেবদেবীর গুণগানের পরিবর্তে স্থান লাভ করে সাধারণ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি, রাজা-প্রজা অর্থাৎ শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রণেতাদের অনেকেই মনে করেন যে, তের শতকে বাংলায় বখতিয়ার খলজির আগমনের পর থেকে চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহী বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ। এর কারণ হিসেবে তাঁরা নতুন শাসকদের ধর্মোন্মাদনা, পীড়ন, লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ প্রভৃতিকে দায়ী করেন। তাঁদের এ যুক্তি অগ্রহণযোগ্য নয় তবে সাথে সাথে একথাও সত্য যে, একটি প্রতিষ্ঠিত শক্তিকে উৎখাত করে নতুন যে কোনো শক্তির অভ্যুদয় হলে দেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক স্থিতিশীলতা কিছুটা হলেও বিনষ্ট হয়। এটা ইতিহাসের অমোঘ সত্য। এক্ষেত্রে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মুসলমানদের আগমনেই বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ শুরু হয়নি। বাংলা সাহিত্যে এ অন্ধকার যুগের সূচনা হয় সেন বংশের শাসনের সময়ে। পাল বংশকে উৎখাত করে সেনরা বাংলায় (কর্ণাটক থেকে) আসে। সেনরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করে এবং উদারপন্থী পালদের সময়ে নির্মিত বহু বিহার ও মঠ ধ্বংস করে। পাল আমল ছিলো বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। পক্ষান্তরে, সেনরা এসে সমাজ কৌলিণ্যপ্রথা, বর্ণপ্রথা প্রভৃতি চালু করে এবং তারা সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকে কোনো রকম নজর না দিয়ে শুধু রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা পাবার চেষ্টা করে। পালযুগে বাংলা সাহিত্যের যে স্বর্ণযুগ ছিলো তার অবসান ঘটে এবং অন্ধকার যুগের যাত্রা শুরু হয়। এ অন্ধকার যুগের ধারাবাহিকতা চলতে থাকে মুসলমানদের আগমনের পরেও। তাই মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগের সূচনা হয় একথা সত্য নয়। কেননা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে প্রথম দেড়শ বছর তুর্কি, খলজি, আফগান, পাঠানদের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে তাৎক্ষণিক অগ্রগতি না হলেও পরবর্তীকালে তাদেরই

Dhaka University Institutional Repository

ধারাবাহিকতায় ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের রাজত্বের সময়ে বাংলা সাহিত্যের ঘটে চরম বিকাশ এবং হোসেন শাহী বংশের সময়কাল হয়ে উঠে বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ। এ ধারাবাহিকতা বাংলায় আফগান শুরী বংশ, কররানী বংশ এবং মুঘলদের সময়েও চলতে থাকে এবং উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ করে। মধ্যযুগে বাংলায় হুসেন শাহ (১৪৩৯-১৫১৯) ও তাঁর পুত্র নুসরত শাহের (১৫১৯-১৫৩২) তুলনা নেই। সম্ভবত হুসেন শাহ ছিলেন আরব, মক্কার শরীফ বংশোদ্ভূত। হিন্দুদের প্রতিও প্রথম দিকে তিনি হয়ত বিরূপই ছিলেন। কিন্তু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য তাঁর ও তাঁর পুত্রের প্রশংসায় মুখর। বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি তার পূর্বেই (আনুমানিক ১৩৫০-১৪৫০ সালের মধ্যে) আপনাকে অনেকটা সংযত করে নিয়েছিলো; হুসেন শাহী রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবার তাই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এজন্য পরে আফগান সুলতান (১৫৫৩-১৫৭৬) বা মুঘল বাদশাহের (১৫৭৪-১৭৬৭) কালেও তার গতি অব্যাহত থাকে।[৬৭]

পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পরেই ইতিহাস লেখার একটি বিশেষ রীতি শুরু হয়। ইংরেজিতে যাকে "avowed history" তা এদেশে আরম্ভ হয় মুসলমানদের আগমনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।[৬৮] পাকভারত উপমহাদেশ তথা বাংলায় ইতিহাস লেখা ও সংরক্ষণে তুর্কি, আফগান, মুঘল শাসকরা অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যেমন-মুঘল বাদশারা বেতন দিয়ে সরকারিভাবে দিনপঞ্জিকা লেখক নিয়োগ করতেন। তাঁরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কখন বাদশাহ কি করতেন তা লিপিবদ্ধ রাখতেন। এ রোজনামচাগুলো পরে সরকারি ইতিহাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। মুঘল বাদশাহ বাবর নিজে রোজনামচা লিখতেন। তাঁর তুজুখ এর শেষে এর নমুনা পাওয়া যায়।[৬৯] এছাড়া মুঘল বাদশা ও শাহজাদীদের অনেকে তাঁদের জীবন-বৃত্তান্ত লিখেছেন।[৭০] যেমন জাহাঙ্গীরের তুযুখ-ই জাহাঙ্গীরী, গুলবদন বেগমের হুমায়ুন নামা, আকবর নামা প্রভৃতি।

সে সময়ের সরকারি ইতিহাস এদেশের ইতিহাস, সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এদের মধ্যে মিনহাজের তাবাকাত-ই-নাসিরী, আমীর-খসরুর কাব্য,

Dhaka University Institutional Repository

জিয়াউদ্দিন বারানী ও শামস-ই-সিরাজের তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, আব্বাস শিরওয়ানীর তারিখ-ই-শেরশাহী, আবুল ফজলের আকবর নামা প্রভৃতি অন্যতম প্রসিদ্ধ সরকারি ইতিহাস হিসেবে উল্লেখযোগ্য।[৭১]

বাংলায় তুর্কি, খলজি আফগানদের আগমনের পর এদেশের ভাষার ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পূর্বে এ অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হলেও মুসলমানদের আগমনের পর ফারসি ভাষার চর্চা শুরু হয় এবং ফারসি ভাষাই হয়ে ওঠে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যম। যদিও আফগানিস্তানের ভাষা পশতু ও দারি কিন্তু গোটা আফগানিস্তানে তৎকালে ফারসি ভাষার চর্চা অব্যাহত ছিলো। আফগানদের মাধ্যমেই বাংলায় ফারসি ভাষার অনুপ্রবেশ ঘটে। কারণ তৎকালীন সময়ে ফারসি ভাষা, পারসিয়ান সংস্কৃতি ছিলো বিশ্বে সবচেয়ে উন্নতমানের সংস্কৃতি। আজ যে আফগান ভূখণ্ড তা কখনো ভারতবর্ষ নিয়ন্ত্রিত কখনো পারস্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। তাই তৎকালীন আফগান ভূখণ্ডে ফারসি ভাষার চর্চা অব্যাহত ছিলো। আফগানিস্তানের অধিবাসী পাঠান। কিন্তু খাস কাবুলের লোক ইরান দেশ থেকে এসে বাড়ি, ঘরদোর বেঁধে শহর জমিয়েছে। তাদের মাতৃভাষা ফারসি।[৭২]

ফারসি ভাষাই ছিলো শিক্ষিত জনের ভাষা, মুসলমানের ভাষা, বাংলায় আফগান শাসনের প্রেক্ষাপটে ফারসি ভাষা হয়ে ওঠে রাজ্যভাষা ও শিক্ষা সংস্কৃতির মাধ্যম। আফগানিস্তান বিশেষ করে গজনির দৌত্যে উত্তর ভারতবর্ষে ফারসি ভাষা তার সাহিত্য সম্পদ, বাইজান্টাইন, সেরাসিন, ইরানি স্থাপত্য, ইতিহাস লিখন পদ্ধতি, ইউনানি, ভেষজবিজ্ঞান, আরবি ফারসি শাস্ত্রচর্চা ইত্যাদি প্রচলিত হয়ে নতুন নতুন ধারা বয়ে নব নব বিকাশের পথে এগিয়ে চলে। একদিন আফগানিস্তান গ্রিক ও ভারতবর্ষকে মিলিয়ে দিয়ে গান্ধার কলার সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিলো, পাঠান তুর্কি যুগে আফগানিস্তান আরব ইরানের সঙ্গে ভারতবর্ষের হাত মিলিয়ে দিল।[৭৩]

ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও শিল্পে মুসলমানদের অবদান রয়েছে। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে শিল্পের যা চর্চা হতো তা ছিলো বেশির ভাগ প্রাণীর প্রতিকৃতি।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের আগমনের পর যদিও এ ভাবধারার পরিবর্তন আসে কিন্তু সব মিলিয়ে তা পরিণত হয় এক উন্নতমানের শিল্পে। বলা হয়ে থাকে মুসলমানদের আগমনের পরই ক্যালিওগ্রাফি বা হস্তলিখন শিল্পের পূর্ণ চর্চা শুরু হয়। ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কন ও টেরাকোটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেকটা অনুৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।[৭৪] এ জন্য মুসলিম শিল্পীরা বিভিন্ন স্থাপত্যের গায়ে প্রাণীর প্রতিকৃতির পরিবর্তে ফুল, লতা-পাতা ও হস্ত শিল্পের চর্চা শুরু করে। এ ক্ষেত্রে মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্যের দরজার পাশে লতা-পাতা অলঙ্করণ ও অন্যান্য স্থানে কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন আয়াত সুন্দরভাবে টেরকোটায় স্থান পায়। তৎকালীন সময়ে পারস্যে এ শিল্পের চর্চা হতো। পারস্য ও আফগানিস্তান থেকে আগত শিল্পীরা এ কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলো। শুধু অলঙ্করণেই নয় স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা সুপ্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে যদিও সুফী সাধকদের দ্বারা এ অঞ্চলে দু'একটি মসজিদ নির্মিত হতো কিন্তু তাতে তেমন কোনো স্থাপত্যিক আদর্শ অনুসরণ করা হয়নি। রাজনৈতিকভাবে মুসলমানদের আবির্ভাবের পর পারস্য স্থাপত্য কলার সাথে এ অঞ্চলের স্থাপত্যের সংমিশ্রণে একটি সুন্দররূপ পরিগ্রহ করে। মসজিদের গম্বুজ ও মিনার ব্যবহার, টেরাকোটা অলঙ্করণ প্রভৃতি মিলিয়ে স্থাপত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ দখল করে নেয়। যেহেতু তুর্কিরা আফগানিস্তান হয়ে বাংলায় আসে তাই পারস্য শিল্পের অনুপ্রবেশের মাধ্যমেই এখানে বিভিন্ন স্থাপত্য নির্মিত হতে থাকে। সুলতানী আমলে যে সকল স্থাপত্য নির্মিত হয় তাতে টেরাকোটার অলঙ্করণ ও হস্তশিল্পের বিকাশ ঘটে।

আর এ স্থাপত্য কলার পূর্ণ বিকাশ লাভ করে মুঘল আমলে। তবে মুঘল আমলে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাণীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে তেমন কোনো বাঁধা আর রইল না। সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজেও ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী এবং সিরাজ ও হিরাত থেকে চিত্রশিল্পী এনে চিত্র অঙ্কন শুরু করেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে নতুন কোনো প্রাণী, পাখি প্রভৃতির সন্ধান পেলেই তা অঙ্কন করে রাখতেন। বাংলায় চিত্রশিল্পের বিকাশে সিরাজ ও হিরাত চিত্রশালার অবদান রয়েছে। সিরাজ চিত্রশালাটি পারস্যে অবস্থিত হলেও হিরাত ছিলো

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানে। সুতরাং ভারতীয় চিত্রশিল্পে আফগানিস্তানের প্রভাব ছিলো। এক্ষেত্রে এদেশের শিল্পের সাথে হিরাত চিত্রশালার সংমিশ্রণে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।

শুধু শিল্পে নয়, মুসলমানদের আগমনের পর এদেশের হিন্দু সমাজ কাঠামোর পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায়। অষ্টম শতকে আরবের বণিক মুসলমানরা বাংলার সমুদ্র উপকূলীয় কোনো কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলো। কিন্তু সে পর্যায়ে ইসলাম ধর্মালম্বী মানুষের সংখ্যা তেমন বাড়েনি। এ অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় এগার শতক থেকে। এ সময় আরবরা সমরখন্দ, গজনি, আফগানিস্তান থেকে উত্তর ভারত ঘুরে সুফী সাধকদের কেউ কেউ বাংলায় আসতে থাকেন। পরবর্তীতে মুসলিম সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম সমাজ কাঠামোই নতুনভাবে বাঙালি সমাজের রূপরেখা তৈরি করে। তের শতকে বখতিয়ার খলজির আগমনের মাধ্যমে বাংলায় তুর্কি-আফগান, খলজি-আফগান শাসনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ কাঠামোর নতুনতর রূপ লাভ করে। এ সত্যটি বুঝতে হবে যে, তুর্কি আফগান, খলজি আফগান, গজনির মুসলমানদের বাংলা বিজয়ে এখানকার সমাজ কাঠামোর একটি সুস্পষ্ট পথ তৈরি করেছিলো। তাঁদের বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন বিজয়ের ভাবাদর্শের আগমন ঘটে তাতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে আসে সংস্কারের ধারা। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পট পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে সমাজ ও সংস্কৃতির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলে। একইভাবে তুর্কি আফগান আগমনের ফলাফল বাংলার জন্য ছিলো সুদুরপ্রসারী। তুর্কি আফগান বিজয়ের সূচনাকালের কথা যদি আমরা মনে করি তাহলে দেখা যাবে এ সময় এদেশের সমাজ, ধর্ম সংস্কৃতির অঙ্গন ছিলো অসংবদ্ধ ও বিশৃঙ্খল। জৈন ধর্মের তখন ক্ষয়িষ্ণুদশা। তখন সমাজ গঠিত ছিলো হিন্দু, বৌদ্ধ আর অন্তজ শ্রেণীর অধিবাসীদের নিয়ে।[৭৫] বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পালদের সময় ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলো অথচ সেন রাজাদের গোড়ামীর কারণে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ভাঙ্গন ধরে। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারা প্রভাবিত সেন রাজারা বৌদ্ধধর্মের প্রতি মোটেও শ্রদ্ধাশীল ছিলো না। এ কারণেই হয়ত তুর্কি আফগান, খলজি ও গজনির মুসলমানদের দ্বারা বাংলায় মুসলমানদের আগমন ও মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা বৌদ্ধদের কাছে ছিলো অনেকটা স্বস্তিকর। বৌদ্ধ

Dhaka University Institutional Repository

পণ্ডিত নামাতার নাথ বলেছিলেন বখতিয়ার খলজি যখন নদীয়া আক্রমণ করেন তখন তাঁর পক্ষ নিয়ে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু গুপ্তচরবৃত্তি করেছিলেন। বাংলায় তুর্কি আফগানদের আগমনের পর যে সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা শুরু হয় তাকে অবিমিশ্র ধারাও বলা যায়। যদিও তুর্কি-আফগান তথা মুসলমানদের আগমনের পর এখানকার সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন আসে কিন্তু পূর্বতর হিন্দু সংস্কৃতি চিরতরে মুছে যায়নি। মুসলিম সংস্কৃতির পাশাপাশি হিন্দু ও অন্যান্য সংস্কৃতির চর্চা চলতে থাকে অবলীলাক্রমে। বলা যায় যে, এ বিভিন্ন সমাজ ও সংস্কৃতির মিশ্র ধারাই পরবর্তীকালে বাঙালি সংস্কৃতি নাম ধারণ করে টিকে আছে।

তথ্য নির্দেশ

১. Donald N. Wilber, *Afghanistan; Its People Its society Its culture* (New Haven: Harf Press, 1962), p.11

২. Joanne Maher, Andrew Thomas (ed.), *Europa World Year Book* (London: Europa Publications Taylor & Francis Group, 2002), p. 385

৩. George Thomas Kurian, *Encyclopedia of the Third world*, Vol. 1 (London: Mansell Publishing Limited, 1982), P. 29

৪. রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ১৫

৫. সুমন চট্টোপাধ্যায় (অনূ.) *প্রাচীন ভারত*, (নয়াদিল্লি: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪), পৃ. ৬৬

৬. কাশীরাম দাস (অনূ.), *মহাভারত*, (কলিকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী, ১৩৯৩ বাংলা), পৃ. ১৯৮

৭. রোমিলা থাপার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৮. কাশীরাম দাস (অনূ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯১

৯. *ঐ*, পৃ. ৮৯২

১০. সুমন চট্টোপাধ্যায় (অনূ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

১১. *ঐ*, পৃ. ১৪০

১২. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩), পৃ. ৩৫০

১৩. *ঐ*, পৃ. ৩৫৩

Dhaka University Institutional Repository

১৪. সুমন চট্টোপাধ্যায় (অনূ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

১৫. সৈয়দ মুজতবা আলী, *দেশে বিদেশে* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৪১০ বাংলা), পৃ. ৬৫

১৬. সুমন চট্টোপাধ্যায় (অনূ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪২

১৭. আল মাহমুদ ও আফজাল চৌধুরী (সম্পা.), *আফগানিস্তান আমার ভালবাসা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১

১৮. ঐ, পৃ. ৩৬৮

১৯. সুমন চট্টোপাধ্যায় (অনূ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৪–১০৫

২০. ড. মোঃ ফজলুল হক, *আফগানিস্তানের ইতিহাস* (রাজশাহী: পাপিয়া সুলতানা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৭), পৃ. ২৪

২১. রোমিলা থাপার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮

২২. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

২৩. রোমিলা থাপার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১

২৪. ঐ, পৃ. ৪৮

২৫. ঐ, পৃ. ৪৯

২৬. ঐ, পৃ. ৫১

২৭. সৈয়দ মুজতবা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪

২৮. সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৮

২৯. রোমিলা থাপার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯

৩০. ঐ, পৃ. ১৯৯

৩১. ঐ, পৃ. ২০১

৩২. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস* (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানি, ২০০০), পৃ. ১

৩৩. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূ. ও সম্পা.), *তবকাত-ই-নাসিরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ১৬

৩৪. ঐ, পৃ. ১৭

৩৫. ঐ, পৃ. ১৭

৩৬. আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭), পৃ. ১৪০

৩৭. ঐ, পৃ. ১০৭

৩৮. ঐ, পৃ. ১১১

৩৯. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

Dhaka University Institutional Repository

৪০. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১

৪১. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯

৪২. ঐ, পৃ. ৪০

৪৩. ঐ, পৃ. ৪৬

৪৪. ঐ, পৃ. ৪৭-৫৬

৪৫. গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনূ.), *তারিখ-ই-ফিরুজশাহী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ১৯

৪৬. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১১২

৪৭. ঐ, পৃ. ১৪০

৪৮. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূ. ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩

৪৯. ঐ, পৃ. ৩

৫০. Ishwari Prasad, *Short History of Muslim Rule in India* (Allahabad: The University of Allahabad, 1939), p. 63

৫১. Sir Jadu-Nath Sarkar (ed.), *The History of Bengal (Muslim Period)*, (New Delhi: Academica Asiatica Patna,), p. 30

৫২. আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূ. ও সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৫৩. Sir Jadu-Nath Sarkar (ed.), *OP.Cit.*, P. 166

৫৪. প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (অনূ.), *বাবুরনামা* (দ্বিতীয় খণ্ড), (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩), পৃ. ২৮৯

৫৫. ঐ, পৃ. ২৮৯

৫৬. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭১

৫৭. ঐ, পৃ. ৩৭৫

৫৮. Sir Jadu-Nath Sarkar (ed.), *Op. Cit.*, P. 176

৫৯. আবদুল করিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭

৬০. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩৪

৬১. প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ (অনূ.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

৬২. সৈয়দ মুজতবা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৬৩. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাঙলায় খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬), পৃ. ১৫

৬৪. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস*, (কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৭ বাংলা), পৃ, ৬, ৭

Dhaka University Institutional Repository

৬৫. ডক্টর এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২), পৃ. ২০

৬৬. *ঐ*, পৃ. ২১

৬৭. গোপাল হালদার, *বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৪০০ বাংলা), পৃ. ৪২

৬৮. কে. এম. মোহসীন, "উপমহাদেশে মুসলিম যুগে ইতিহাস লেখকদের লেখার রীতি ও বিষয়বস্তু: ক্রমধারা এবং পরিবর্তন", *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২৫-২৬ সংখ্যা, (ঢাকা, ২০০২) পৃ. ২০৭

৬৯. *ঐ*, পৃ. ২০৮

৭০. *ঐ*, পৃ. ২০৭

৭১. *ঐ*, পৃ. ২০৯

৭২. সৈয়দ মুজতবা আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

৭৩. *ঐ*, পৃ. ৬৭, ৬৮

৭৪. ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা*, (ঢাকা: অধুনা প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ২০২

৭৫. এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, "সুলতানী বাংলায় ধর্ম-চিন্তা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ২৫-২৬ সংখ্যা, (ঢাকা, ২০০২), পৃ. ২৬০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আফগানিস্তানের ভূমিকা

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান ও ভারত রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ববাংলা নামক আজকের বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রদেশে পরিণত হয়। হাজার মাইলের ব্যবধানে পশ্চিম পাকিস্তান একই দেশের অংশ হলেও এদেশে শোষণ চালাতে থাকে ইংরেজদের মতোই। এমনিভাবে অত্যাচারিত এবং শোষিত হয়ে এদেশের মানুষের মনে এক তীব্র বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে বছরের পর বছর - প্রায় দুই যুগ। একদিন সেই বিক্ষোভ গণ আন্দোলনে রূপ নেয়। নিষ্ঠুর হত্যা আর দমন নীতির মাধ্যমে এ আন্দোলনকে প্রতিহত করতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙালির উপর। পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান পেল বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম নামক নতুন শব্দটি। আর একে ব্যর্থ করতে পাকিস্তানি শক্তি হয়ে উঠল অধিক তৎপর। কিন্তু এটা ইতিহাসের গতিকে রুদ্ধ করার এক ব্যর্থ প্রয়াস। পাকিস্তানি শাসক চক্রের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ করে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ইসলামি বিশ্বের ভূমিকা ছিলো বাংলাদেশ বিরোধী ও পাকিস্তানপন্থী। ১৯৭১ সালের মে মাসে ২২ সদস্য বিশিষ্ট ইসলামি সম্মেলন সংস্থা জেদ্দা অধিবেশনে 'জাতীয় ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানায়। অধিবেশনের শেষে প্রকাশিত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য বিদেশী শক্তিকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করা হয়। তবে কয়েকটি দেশের ভূমিকা ছিলো ভিন্ন। এক্ষেত্রে প্রথমই আসে ইরাকের কথা যে দেশটি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। আরেকটি ব্যতিক্রম মিশর। মিশরের দৃষ্টিতে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সঠিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়নি।[১] আরেকটি উল্লেখযোগ্য দেশ হল আফগানিস্তান। দেশটি মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্ব থেকেই বাংলাদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও দাবি-দাওয়াকে সমর্থন করেছে। ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আফগানিস্তানের ভূমিকা ছিলো অগ্রগণ্য। ১৯৭১ সালের মে মাসের শেষ দিকে আফগানিস্তানে অবস্থানরত প্রবীণ জননেতা খান আব্দুল গাফ্ফার খান বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, বেতার যোগে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সামরিক শাসন জারির খবর তিনি পেয়েছেন। এর ফলে বাঙালিদের উপর ভীতির রাজত্ব কায়েম হয়েছে। তাদের দুর্দশার জন্য তিনি অত্যন্ত বেদনা বোধ করেন।[২]

প্রকৃত পরিস্থিতি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো ও কাইয়ুম খান কর্তৃক মিথ্যা প্রচারণার সমালোচনা করে গাফ্ফার খান বলেন, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য নয়; ক্ষমতা দখল করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। পাঞ্জাবের ধনিক শ্রেণী এবং উর্দ্ধতন সামরিক নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা দখল করেছে। হতভাগ্য বাংলার আর কোনো অপরাধ নেই; তারা নির্বাচনে জয়লাভ করেছে– এটাই তাদের অপরাধ। বাঙালিদের সঙ্গে আজ যে খেলা হচ্ছে, সেই একই খেলা পাকতুনদের সঙ্গে পাকিস্তান গঠনের সময় অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, "পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষ সব সময় ধর্মের নামে আমাদের প্রতারিত করেছে। তারা পাকিস্তান ও ধর্মের নামে কথা বলার অধিকারী বলে দাবি করে। বাংলায় যা' ঘটেছে তা' কি ইসলামের জন্য ঘটেছে? আমরা একটানা সামরিক শাসনের আওতায় রয়েছি, একথা দয়া করে আপনারা মনে রাখবেন।"[৩]

গাফ্ফার খান প্রকাশ করেন, জালালাবাদে নিয়োজিত পাকিস্তানি কন্সাল তাঁর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারকালে বাঙালিরা পাকিস্তান ধ্বংস করেছে বলে উল্লেখ করেন। এর উত্তরে তিনি বলেন, ট্যাংক, মেশিনগান ও বোমা দিয়ে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা যাবে না। পাকিস্তান সরকার বাস্তবিকই যদি দেশে সংহতি রক্ষা করতে চায়, তাহলে তিনি শেখ মুজিব ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য মধ্যস্থতা করতে রাজী হবেন। পাকিস্তান সরকার যদি শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় তাহলে তিনি বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।[৪]

ভারতের সর্বোদয় আন্দোলনের মুখপাত্র "সর্বোদয় সাধনা" পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে আব্দুল গাফ্ফার খান বলেন, ইয়াহিয়া চক্র কর্তৃক পশ্চিম পাঞ্জাবের আমলাতন্ত্র ও পুঁজিবাদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা হস্তান্তর করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেন তা সমর্থন করবে কিনা তা পাকিস্তানের জনগণের ভেবে দেখা উচিত। তিনি আরো

Dhaka University Institutional Repository

বলেন, পাকিস্তানের সংহতি বজায় রাখার জন্য ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলা আক্রমণ করেনি এবং ইসলামের খাতিরেও তা করা হয়নি। পূর্ব বাংলার জনসাধারণের একমাত্র অপরাধ হলো তারা সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেছে। পূর্ব বাংলার জনসাধারণ শুধুমাত্র একটি প্রদেশ নয়, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে। তা সত্ত্বেও তারা বিচ্ছেদকামী বলে অভিযোগ করা হচ্ছে। ভুট্টোর সমলোচনা করে গাফ্ফার খান বলেন, কখন তিনি কি করবেন তার ঠিক নেই এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতি কারো আস্থা নেই। তাঁর মনের কথা বোঝা কঠিন। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, গোড়ার দিকে ভুট্টো ছ'দফা সমর্থন করেন। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারেন পাকিস্তানের দু'অংশে পৃথক সংসদ সৃষ্টি করা হলে তিনি ক্ষমতাসীন হতে পারবেন, তখনই তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। তারপর থেকে ছ'দফা পাকিস্তানের সংহতির বিরুদ্ধে বলে তিনি প্রচার করতে শুরু করেন।[৫] পাকতুন দিবস উপলক্ষ্যে কাবুলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পাকতুন নেতা আব্দুল গাফ্ফার খান বলেন, পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করেছে এবং শহর ও গ্রামাঞ্চলে বহু বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়ে ধ্বংস করেছে। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা ভারতে এবং পূর্ব বঙ্গের বনে -জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। কোনো কোনো গণতান্ত্রিক দেশ এবং কয়েকটি মুসলিম দেশ পূর্ববঙ্গে সংঘটিত গণহত্যা সম্পর্কে নীরব থাকার জন্য তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।[৬] কাবুল থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মিল্লাত' শেখ মুজিবের বিচার প্রহসনের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে। পত্রিকাটির সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় পাকিস্তান অমানুষিক এবং ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ ধামাচাপা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। শেখ মুজিবকে কারাদণ্ড দিয়ে কিংবা হত্যা করে পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি জনসাধারণের রায় পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।[৭]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি আফগানিস্তানের সহানুভূতির প্রধান কারণ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক। আফগানিস্তানের রাজা মোহাম্মদ জহির শাহের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক অনেক দিনের। সে জন্যেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে জুলাই মাসে জুলফিকার আলী ভুট্টো কাবুল সফরে এসে মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে আফগানিস্তানের রাজা মোহাম্মদ জহির শাহকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন- তিনি যেন বাংলাদেশ ইস্যুতে সোভিয়েত

Dhaka University Institutional Repository

ইউনিয়নের ওপর তাঁর প্রভাব খাটান। মূখ্য বিষয় ছিলো পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে সহযোগিতা করা। এতোদিন পর্যন্ত আফগানিস্তানের রাজা মোহাম্মদ জহির শাহ কেবলমাত্র একতরফা পাকিস্তানের বক্তব্যই শুনেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মস্কো সফরে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে নিরস্ত্র নিরীহ মুসলমানদের গণহত্যার কথা শুনেন। তাঁরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুহাম্মদ মুসা শফিক আফগান রাজাকে সবকিছু অবহিত করেছেন। সমসাময়িক সময়ে মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের নেতৃত্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য আফগানিস্তানে যান।

ভারতীয় উর্দু পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী বাংলাদেশ সম্বন্ধে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি নূরুল কাদিরের সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলনের বিস্তারিত বিবরণ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. এল. মেহতার নিকট থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ মুসা শফিক পেয়েছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী অনুবাদসহ সেটি আফগানিস্তানের রাজার নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেই সাথে মোহাম্মদ নূরুল কাদির কাবুলে যাবার সময়- সঙ্গে করে দু'টি প্রামাণ্য চিত্র (১) ডায়েরি অন বাংলাদেশ এবং (২) রিফিউজি'৭১ নিয়ে গিয়েছিলেন। এতে আফগানিস্তানে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিলো। পাকিস্তানি প্রচারণা যে মিথ্যা তা খুব ভালোভাবে ঐ দু'টি প্রামাণ্যচিত্র প্রমাণ করে দিয়েছিলো। উল্লেখ্য, নূরুল কাদির সহ প্রতিনিধি দলটি কাবুল পৌঁছে ২৮ আগস্ট, ১৯৭১।[৮] নূরুল কাদিরের সাথে এ সফরের প্রধান সঙ্গী ছিলেন আব্দুস সামাদ আজাদ। ১৯৭১ সালে আফগানিস্তানের রাজা ছিলেন মোহাম্মদ জহির শাহ। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ড. আব্দুল জহির। ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ড. আব্দুস সামাদ হামেদ। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন মোহাম্মদ মুসা শফিক ও সিনেটের সভাপতি ছিলেন আব্দুল হাদি দাউই। তাঁরা সকলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ে সাধারণভাবে সহানুভূতিশীল ছিলেন।[৯]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পাকতুনিস্তান প্রশ্নে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের মতবিরোধ থাকায় পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পর্কের উন্নতি ঘটেনি কোনো দিনই। অপর পক্ষে পাকতুনিস্তান ইস্যুতে ভারত প্রথম থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানকে সমর্থন করায় ভারতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আফগানিস্তানের ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো।[১০] বোম্বের বিভিন্ন উর্দু সংবাদপত্রে বাংলাদেশ সম্বন্ধে যে সকল প্রতিবেদন ও সচিত্র সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলনে বিস্তারিত প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিলো, তাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এসব উর্দু সংবাদপত্রের ফটোস্ট্যাট কপি আব্দুল গাফ্ফার খান (সীমান্ত গান্ধী) এর পক্ষে পাকতুনদের মাধ্যমে আফগানিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার একমাত্র ঐতিহাসিক রাস্তা খাইবারপাস দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। এর মাধ্যমে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণ আসলে বাংলাদেশে কি ঘটেছে তা জানতে পারেন। ভারতীয় উর্দু সংবাদপত্রের মালিক, সম্পাদক, সাংবাদিক ও ফটোস্ট্যাট বহনকারী পাকতুনগণ সকলেই মুসলমান ছিলেন বলে ভারতীয় উর্দু সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে খবরগুলোর বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে গিয়েছিলো। ভারতের উর্দু পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ঐ সকল খবর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের পক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে জনমত গঠনে যেভাবে সাহায্য করেছিলো, ঠিক সেই একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণকে আসল ঘটনা জানতে সাহায্য করেছিলো। ফলে পরোক্ষভাবে সেগুলো বাংলাদেশের পক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছে।

সেই প্রথম পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে সঠিক তথ্য জানতে পেরেছিলেন। মহান নেতা খান আব্দুল গাফ্ফার খানের সমর্থক পাখ্তুনগণ অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ কর্মী ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেহারা, পোশাক, ভাষা ইত্যাদির সবরকম মিল ছিলো বলে তাঁদের পক্ষে ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করা সম্ভব হয়েছিলো। উল্লেখ্য যে, পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের এবং আফগানিস্তানের পাকতুনদের মাতৃভাষা ছিলো পশ্তু।[১১]

পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলোতে বলা হতো একাত্তরের মার্চ মাসে বাঙালিরা পূর্ব পাকিস্তানে বিহারিদের হত্যাযজ্ঞ আরম্ভ করায় বিহারিদের জানমাল ও সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ, ১৯৭১ মধ্যরাতে সামান্য কিছু অ্যাকশন নিতে বাধ্য হয়েছিলো। পরবর্তী সময়ে ভারত থেকে কিছু সশস্ত্র দুংস্কৃতিকারী তথাকথিত মুক্তিবাহিনী নামে পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেছিলো। ফলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা

Dhaka University Institutional Repository

ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে ঐ সকল ভারতীয় সশস্ত্র দুঃকৃতিকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের তৎপরতা দমন করার জন্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সামান্য কিছু অ্যাকশন নিতে বাধ্য হয়েছিলো। সে সময় যে সকল পূর্ব পাকিস্তানি স্থানচ্যুত হয়ে ভারতে চলে গিয়েছিলো তাদেরকে ফেরত আনার জন্যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে অভ্যর্থনা কেন্দ্র খুলেছে। ঐ সকল স্থানচ্যুত পূর্ব পাকিস্তানিগণ স্বদেশে ফিরে আসতে আগ্রহী। কিন্তু ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদেরকে নিয়ে ব্যবসা ও প্রচারণা করার লোভে, তাদেরকে জোর করে শরণার্থী শিবিরগুলোতে আটকে রেখেছে। তাদেরকে স্বদেশে অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসতে বাঁধা সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাদেরকে তথাকথিত রিফিউজি বা উদ্বাস্তু নাম দিয়ে ভারত বিদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে ত্রাণসামগ্রী আনার ব্যবস্থা করে তা আত্মসাৎ করছে। যাদের জন্য ও যাদের দেখিয়ে ঐ প্রচুর ত্রাণসামগ্রী বিদেশ থেকে ভারত আনার চেষ্টা করেছে, তারা কিন্তু ঐ সমস্ত ত্রাণসামগ্রী পায়নি। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ঐ সকল ত্রাণসামগ্রী নিজেদের কাজে ব্যবহার করছেন। কাজেই পাকিস্তানি প্রচার মাধ্যমের মতে পূর্ব পাকিস্তানে কোনো গণহত্যা পাকিস্তান সেনাবাহিনী করেনি। ঐ সকল খবর ভারতীয় প্রচার মাধ্যম ও পূর্ব পাকিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা বানানো গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমে আরও বলা হতো - পূর্ব পাকিস্তানে আগের মতো সবই স্বাভাবিকভাবে চলছে। বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে নাজীরা যেভাবে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে বিশ্বকে বোকা বানিয়ে ধোকা দেওয়ার বৃথা চেষ্টা করেছিলো। ঠিক একইভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বরং আরও নিপুণতার সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের তথাকথিত গণহত্যা ও মুক্তিবাহিনীর চমকপ্রদ তথাকথিত মিথ্যা বিজয়ের নতুন গল্প বানিয়ে এবং তা সুন্দরভাবে প্রচার করে বিশ্বকে বোকা বানানোর ও ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে পাকিস্তানকে বিশ্ব দরবারে হেয় করার বৃথা চেষ্টা করছে। আর এর মূল কারণ হচ্ছে– ভারত কাশ্মীরে যে পুলিশি রাজত্ব কায়েম করেছে এবং সেখানে যে অমানুষিক দমননীতি বছরের পর বছর ধরে চলছে তা বিশ্বের কাছ থেকে আড়াল রাখার জন্যেই ভারত এটা করছে।

তাছাড়া পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলোতে আরো বলা হতো– পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে তথাকথিত বাংলাদেশ বানিয়ে পাকিস্তানকে দুর্বল করার এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতেছে ভারত এবং তা করেছে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে। পাকিস্তানের অঙ্গহানি করে অর্থাৎ পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে পাকিস্তানকে দুর্বল করতে পারলে ভারতের দুই প্রকার লাভ হবে। (১) পাকিস্তান আর কোনো দিন ভারতের

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবেনা। (২) যদি কোনো দিন কোনো কারণে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাঁধে তাহলে, ভারতকে আর ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের মতো একই সঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ চালাতে হবে না। ফলে ভারত সহজেই জয়লাভ করতে সক্ষম হবে। মূলত এসব খবর প্রকাশিত হয়েছিলো কাবুলে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের নিজস্ব বুলেটিনে। নূরুল কাদির ও আব্দুস সামাদ আজাদের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে প্রেরিত প্রতিনিধিদলটি আফগানিস্তান গিয়ে এসব সংবাদ পড়তে সক্ষম হয়। ফলে পরবর্তীতে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে অনেক সুবিধা হয় এবং পাকিস্তানে মিথ্যা প্রচারাভিযানের সঠিক জবাব দেওয়া বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো। যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের প্রচার মাধ্যমগুলো আপ্রাণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রচারণা যে মিথ্যা তা বুঝতে পেরে শেষ পর্যন্ত বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে চলে এসেছিলো। এজন্য বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের কাবুল সফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।[১২]

বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল আফগান কর্তৃপক্ষকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলো যে, বাংলাদেশে যে সকল তরুণ জীবন বাজী রেখে স্বাধীনতা যুদ্ধে লড়ছে তারা যথার্থই মুক্তিবাহিনী এবং তারা INDIAN MISCRENTS অর্থাৎ 'ভারতীয় দুষ্কৃতকারী'ও নয়। পাকিস্তান দূতাবাস কর্তৃক প্রকাশিত নিউজ বুলেটিন এর তথাকথিত ভাষ্য মোতাবেক ঐ সকল ভারতীয় সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের জন্যই বাংলাদেশে অশান্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগীদের ফেরত যেতে বাঁধা দিয়েছে ভারত, যে তথ্য আদৌ সঠিক নয়। পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার তথ্য অনুযায়ী ভারত বিশ্ববাসীর সহানুভূতি আদায় করে আর্থিক লাভবান হওয়ার চেষ্টা করেছে। যদি তাই হয় তাহলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ মোতাবেক প্রায় ১ কোটি রিফিউজি বা শরণার্থী প্রাণের ভয়ে বাংলাদেশ থেকে আপন ঘরবাড়ি ভিটে ফেলে এক কাপড়ে ভারতের শরণার্থী শিবিরগুলোতে অমানুষিক দুঃখ কষ্ট ভোগ করার জন্য এবং মানবেতর জীবন যাপনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতো না। বাংলাদেশে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে এ খবর পাকিস্তান বিদেশে তার তথাকথিত নিউজ বুলেটিন এর মাধ্যমে অস্বীকার করলেও বিদেশী প্রচার মাধ্যমগুলোর বদৌলতে সমগ্র বিশ্ববাসী ঐ খবর জেনে গিয়েছিলো। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি দখলদার সেনাবাহিনী বাংলাদেশে গণহত্যা করায়, যে প্রায় ১ কোটি মানুষ নিজ ভিটেমাটি ফেলে প্রাণের ভয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিতে

Dhaka University Institutional Repository

বাধ্য হয়েছিলো এবং আরও প্রায় ১ কোটি মানুষ যে নিজ বাড়িঘর ছেড়ে বাংলাদেশের মধ্যেই গ্রামে গঞ্জে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলো, তা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত সত্য।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের খবর সমগ্র পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলো। ভারতের বিভিন্ন উর্দু সংবাদপত্রে প্রকাশিত বাংলাদেশ সম্বন্ধে পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী প্রতিবেদন, নূরুল কাদিরের সাক্ষাৎকার ও সংবাদ সম্মেলন এর খবর যা বোম্বের 'দি উর্দু রিপোর্টার ডেইলি' এর সম্পাদক আব্দুর রশিদ দিল্লি পাঠান যাতে পাকিস্তান ভেঙ্গে কেন আমরা বাংলাদেশ চাই এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও সর্বশেষ খবরাখবর ছিলো। এ খবর বাংলাদেশ ইস্যুতে পাকিস্তানি মিথ্যা প্রচারণার জবাব হিসেবে ভারতীয় নিউজ বুলেটিনে ছাপা হয়েছিলো। কাবুলে ভারতীয় দূতাবাস বাংলাদেশ সম্বন্ধে ঐ সকল নিউজ বুলেটিনের কপি অন্যান্য দেশে ভারতীয় দূতাবাস সমূহে পাঠিয়েছিলো। পাকিস্তানি মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ইস্যুতে বিভিন্ন দেশে ভারতীয় দূতাবাসসমূহ ভারত ও বাংলাদেশের পক্ষে ঐ ধরণের নিউজ বুলেটিন ছাপিয়ে প্রচার করেছিলো। ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে প্রচুর উপকার হয়েছিলো। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ অতি অল্প সময়েই স্বাধীনতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলো।[১৩]

শতাব্দীকালব্যাপী বাঙালিরা ভ্রমণকারীদের কাছে আফগানিস্তানের কাহিনী শুনে আসছে। বহুদিন ধরেই আফগানদের দীর্ঘকায় পাগড়িপড়া হাস্যোজ্জ্বল চেহারা বাঙালিদের নিকট অতি পরিচিত। তারা তাদের আচার ব্যবহার দ্বারা অতি সহজেই বাঙালির অন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। আর তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সৈয়দ মুজতবা আলীর লেখনীতে। আর কাবুলিওয়ালার গল্প ও অন্যান্য লেখকদের কাহিনী বাস্তবে প্রমাণিত হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় হাজার হাজার বাঙালি পাকিস্তান কারাগার থেকে পালিয়ে অথবা পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে গিয়ে পেয়েছিলো খাবার ও আশ্রয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে আসা সম্ভব ছিলোনা। কারণ পাকিস্তান ভারত সীমান্ত পূর্বেই সীল করে দিয়েছিলো। তাই পাকিস্তান হতে পালিয়ে বাংলাদেশে আসার একটি মাত্র রাস্তা ছিলো যা আফগানিস্তান হয়ে প্রথমে ভারত

Dhaka University Institutional Repository

ও পরে বাংলাদেশ। ঐ ক্রান্তিলগ্নে আফগানিস্তানের মতো বন্ধু রাষ্ট্র যদি সাহায্য না করতো তাহলে বাঙালিরা এতো সহজে পাকিস্তান হতে পালাতে সক্ষম হতো না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের বহু কর্মকর্তা, কর্মচারী, সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনীর সদস্য পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলো। যুদ্ধ শুরু হবার পর তাদের উপর নেমে আসে অত্যাচারের স্টীম রোলার। উপায়ন্তর না দেখে তারা পালাতে থাকে দিগ্বিদিক। কিন্তু পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা তখন সহজতর ছিলো না। আর এ দুঃসময়ে যে দেশটি তার সীমান্ত ব্যবহার করতে দিয়েছিলো সে দেশটি হল আফগানিস্তান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাঠানরা বাঙালিদের সীমান্ত পারাপারের ব্যবস্থা করে সাহায্য করেছে। এ যেন এক দুঃসাহসিক অভিযান। এসব অভিযানে ব্যবহার করা হয় বড় বড় মালবাহী ট্রাক বা লরি। উপরে মালামাল দিয়ে ট্রাক বোঝাই করে ভেতরে কৌশলে রাখা হতো বাঙালি যাত্রীদের। ঘুম পাড়িয়ে দিতেন মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ঘুমের ঔষধ খাইয়ে। দীর্ঘ সময়ের পথ কিন্তু কোনো রকম কথাবার্তা বা শব্দ করা চলবেনা। মাল বোঝাই বিরাট দানবের পেটে ঘাপটি মেরে মৃতপ্রায় অবস্থায় এ দুঃসাহসিক অভিযানে বাঙালিরা পাড়ি জমায়।[১৪]

পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে কড়া নজরদারীর মধ্যে রাখতো। তাদের সবসময় অনুসরণ করা হতো যেন তারা কোনোভাবেই পশ্চিম পাকিস্তান ত্যাগ করে বাংলাদেশে এসে নিজ দেশের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পারে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত সকল বাঙালি অফিসার ছিলেন দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদগ্রীব। তাঁরা যে যেমন ভাবে পেরেছে সেভাবেই বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন। এরই প্রমাণ মেলে মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান-এর পূর্বাপর ৭১ নামক বইটিতে। তিনি তৎকালীন সময় ব্রিগেডিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন তিনি দেশে ফেরার জন্য অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে আফগান সীমান্ত ব্যবহার করে দেশে ফেরার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এরই মধ্যে কর্ণেল তাহের ও ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন তাঁর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাঁরাও একই সাথে বাংলাদেশে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু প্রথম দিকে খলিলুর রহমান তাঁদের কথায় রাজী না হলে, তাহের ও জিয়াউদ্দিন

Dhaka University Institutional Repository

অত্যন্ত মুষড়ে পড়েন এবং অনুরোধে খলিলুর রহমানকে রাজি করান। পরদিন ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খলিলুর রহমান, তাহের ও জিয়াউদ্দিনের কর্মস্থল শিয়ালকোর্ট ব্রিগেড সদর দফতরের টেলিফোন থেকে জানতে পারেন যে, ব্রিগেডের ব্রিগেড জেনারেল মেজর আবুল মনসুর, তাহের ও জিয়াউদ্দিনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তখন খলিলুর রহমান বুঝতে পারেন যে তাঁরা তিনজনে পরিবার পরিজন নিয়ে সফলভাবে আফগান সীমান্ত ব্যবহার করে বাংলাদেশে চলে গেছেন।[১৫]

মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে আফগান সীমান্ত দিয়ে পাঠানদের সহযোগিতায় অনেক বাঙালি পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা দেশে ফিরে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন আবার অনেকে সদিচ্ছা থাকলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে দেশে ফিরতে সক্ষম হননি। এমন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল এরশাদ (পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট) অন্যতম। তিনি পাকিস্তানে সপ্তম বেঙ্গলের দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মনস্থ করে এ ব্যাপারে খলিলুর রহমানের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু করাচি থেকে প্রায় পাঁচশত মাইল কাঁচা ও পাকা রাস্তা অতিক্রম করে এক রাতে আফগান সীমান্তে পৌছা সম্ভব নয় বলে এরশাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।[১৬]

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও বন্ধুসুলভ। বিপদের সময়ে আফগানিস্তান বাংলাদেশকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। আফগানিস্তান এমন একটি দেশ যে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম থেকেই বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয় এবং বাংলাদেশের মানুষের ন্যায় সঙ্গত অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে স্বাগত জানায়। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের বিরাগভাজন হয়েও আফগানিস্তান তার মতামত পরিবর্তন করেনি।

তথ্য নির্দেশ

১. *The Bangladesh Observer*, 19 June, 1973

২. আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী, বাংলাদেশ: ১৯৭১* (ঢাকা: অনন্য প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৬৩

৩. ঐ, পৃ. ৬৪

Dhaka University Institutional Repository

৪. *India News*, 29 May, 1971

৫. আব্দুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯১

৬. *India News*, 4 September, 1971

৭. *Ibid*, 4 September, 1971

৮. মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ২৪৬

৯. ঐ, পৃ. ২০৯

১০. ঐ, পৃ. ২৪০

১১. ঐ, পৃ. ২৩৯

১২. ঐ, পৃ. ২৪৪-২৪৫

১৩. ঐ, পৃ.২৪৭-২৪৮

১৪. নূর হাসনা লতিফ, *পাকিস্তানে আটক দিনগুলি* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ১৩

১৫. মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (অব:), *পূর্বাপর ১৯৭১: পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ.৩২-৩৩

১৬. ঐ, পৃ.২৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক : মুজিব আমল (১৯৭১-১৯৭৫)

(ক) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : রাজনৈতিক সম্পর্ক

বাংলাদেশ একটি ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্র। ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের অর্থনীতির ভৌত কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়ার পাকিস্তানি কৌশলের কারণে জন্মলগ্নে রাষ্ট্রটি অত্যন্ত দুর্বল ও দরিদ্র ভাবমূর্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলো। সে কারণে জন্মলগ্ন থেকেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিলো দ্রুত আর্থ-সামাজিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ ও কারিগরি সহযোগিতা নিশ্চিত করা। কাজেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ছিলো বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর অর্থনৈতিক নীতি। কিন্তু জন্মলগ্নে অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতার উৎস ছিলো খুব সীমিত। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে শুধু ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ ও ব্রিটেনের মতো কিছু পুঁজিবাদী দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্ব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো উন্নত ও বড় বড় শক্তি বাংলাদেশকে সমর্থন করেনি। কাজেই উন্নত ও পুঁজিবাদী দেশসমূহ থেকে সহযোগিতার কোনো সম্ভাবনা ছিলো না। কিন্তু সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন ছিলো সর্বাধিক সংখ্যক রাষ্ট্রের কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় করা।

ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে এ দু'টো প্রধান লক্ষ্য সমন্বিতভাবে অর্জন করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়ে অনুসৃত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির উদ্দেশ্য ছিলো প্রধানত দু'টি- কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায় ও বৈদেশিক উৎস থেকে সাহায্য ও সহযোগিতা অর্জন। তবে অর্থনৈতিক কুটনীতিই প্রাধান্য পেয়েছিলো। উপরন্তু জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ লাভও ছিলো গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

স্বীকৃতি আদায়ের কুটনীতি দু'টো পর্বে বিভক্ত ছিলো: মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী। মুক্তিযুদ্ধপর্বে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শুধু ভারত ও ভুটান ছাড়া অন্য কোনো রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং সেটাও ছিলো যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে। দ্বিতীয় পর্বে স্বীকৃতি আদায় করা তুলনামূলকভাবে সহজতর হলেও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশকে যথেষ্ট উদ্যোগী হতে হয়েছিলো। পাকিস্তানের অপপ্রচারের কারণে তখনও অনেক রাষ্ট্র বাংলাদেশের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করতো।[১] কিন্তু এ রকম এক বৈরী পরিবেশেই ১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আফগানিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।[২] এবং নিজেকে বাংলাদেশের বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে প্রমাণ করে।

এ অর্থনৈতিক কূটনীতির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ তখন আর শুধু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকেনি। তখন বাংলাদেশ কোনো ব্লকে অবস্থান না করে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সাথে সাথে পশ্চিমা বিশ্বের সাথেও সম্পর্ক স্থাপনে তৎপর হতে থাকে। ১৯৭৪ সালে ওআইসির সদস্যপদ পাওয়ার সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়; আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক যদিও পূর্ব থেকেই উষ্ণ ছিলো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর বহু বাঙালি পাকিস্তানে আটকেপড়ে। বাংলাদেশের জন্য তাই প্রথম দায়িত্ব ছিলো পাকিস্তান থেকে এসকল আটকেপড়া বাঙালিদের ফেরত আনা। বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবসে শেখ মুজিবর রহমানের বেতার ও টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে উপরোক্ত কথাটিরই প্রতিফলন ঘটে। তিনি বলেন, পাকিস্তানি শাসকরা পাঁচ লক্ষ নিরীহ বাঙালিকে সন্ত্রাস ও দুর্দশার মধ্যে আটকে রেখেছে। তিনি আরও বলেন, তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হোক এবং আটক বাঙালিদেরকে কোনো ক্রমেই যুদ্ধবন্দির সমপর্যায় ভাবা চলবে না।[৩]

পাকিস্তান থেকে বাঙালিদেরকে ফিরিয়ে আনার পূর্বেই বহু বাঙালি পালিয়ে আফগানিস্তান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরও আফগান সীমান্ত ব্যবহার করে এই পালানো প্রক্রিয়াটি অব্যাহত ছিলো বন্দি বিনিময় চুক্তি (১৯৭৩) হওয়ার আগ পর্যন্ত। ফলে পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের শহরের বাইরে বন্দিশিবিরে নিয়ে যায়। জুন, ১৯৭২ কাবুল ও অন্যান্য সীমান্ত দিয়ে সহস্রাধিক বাঙালি অফিসারের পলায়নের পর পাকিস্তান সরকার এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে।[৪] ১৯৭২ এ যারা প্রাণ নিয়ে আফগান সীমান্ত ব্যবহার করে বাংলাদেশে আসতে সক্ষম হয়েছিলো তার মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদক জনাব মোস্তফা সারোয়ারের ছোট ভাই হাসান সারোয়ার, তাঁর মা, বোন ও ছোট ভাই অন্যতম।[৫]

ভারতীয় হাইকমিশনের একজন মুখপত্র জানান যে, গত কয়েকমাস ধরেই পাকিস্তান থেকে আটকে পড়া বাঙালিরা পালিয়ে আসছেন। এর মধ্যেই কয়েক হাজার বাঙালি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কড়া নজরের মুখে আফগানিস্তান হয়ে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসেছেন।[৬] এসময় যাঁরা পালিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফখরুদ্দিন আহমেদ অন্যতম (পরবর্তীকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব)। তিনি কোয়েটা হয়ে আফগানিস্তান সীমান্তের দিকে এসেছিলেন।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান উভয় প্রদেশের সরকার বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলো। বাঙালিদের পলায়নে তারা বাঁধার সৃষ্টি করেনি। এ দুই প্রদেশের ভেতর দিয়ে বহু বাঙালি পালিয়ে আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। ঐ সময়ে দুই প্রদেশে ক্ষমতাসীন ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সরকার। ফখরুদ্দিন আহমেদ ও তাঁর পরিবার প্রথমে কান্দাহার যান ও পরে আফগানিস্তানে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনারের সাহায্যে কাবুল হয়ে দিল্লি পৌছেন। তিনি বলেছেন এ সময়ে কাবুলের হোটেলগুলো ছিলো বাঙালিতে ভরা। সিনিয়র সহকারী অফিসারদের পালিয়ে আসায় পাকিস্তান সরকার আফগান সরকারের কাছে এসব বাঙালিদের ফেরত চায় কিন্তু আফগান সরকার এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। কেননা আফগান সরকার বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা ও তৎসময়ের পরিস্থিতির জন্য সহানুভূতিশীল ছিলো।[৭] এ সময়ে আরো যাঁরা আফগানিস্তান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের তৎকালীন পাইলট অফিসার শওকত জাহান চৌধুরী, শামশের আলী (পরবর্তীতে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সের এয়ার কমোডর), মেজর মান্নান ও তাঁর পরিবারের সদস্য, লেফটেন্যান্ট কর্ণেল (অব.) এম এ হামিদ, তাঁর স্ত্রী বাংলাদেশের স্বনামধন্য দাবারু রানী হামিদ, তাঁর বড় ছেলে কায়সার হামিদ (মোহামেডান দলের ফুটবলার) ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য, কমাণ্ডার এম.এ. খান (পরবর্তীতে রিয়ার এডমিরাল ও নৌবাহিনী প্রধান) সহ আরো অনেকে। প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের শেষ দিক থেকে পাকিস্তান হতে কাবুলে পৌছার রাস্তা হিসেবে পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত খাইবার পাস

Dhaka University Institutional Repository

ও বোলান পাস গিরিপথ দু'টিকে বাঙালিরা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তান সরকার এ পথ দু'টির সন্ধান পেয়ে কড়া নজরদারী আরোপ করে। এজন্য উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তান হতে পাকতুনিস্তান অঞ্চল হয়ে হিন্দুকুশ পর্বত ও ডুরাণ্ড লাইন পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে জালালাবাদ হয়ে কাবুলে পৌছতেন। পরবর্তীতে আফগান সরকার ও ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় দেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হতেন। পর্বত সঙ্কুল এ পথ অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আফগান পাঠানরা গাইড হিসেবে সাহায্য করতো।[৮]

১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন তৎকালীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান অফিসের কর্মকর্তা ফজলুর রহিম ও পাকিস্তান নৌবাহিনীর সিভিলিয়নে চাকুরিরত তাঁর ছোট ভাই আব্দুল করিম। ফজলুর রহিম ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বরে পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আফগানিস্তানে আসেন। তাঁর ভাষ্য, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বন্দি বিনিময় চুক্তি না হওয়াতে তখনও বাঙালিরা পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে ছিলো। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়াতে এবং এখানে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিরা আটকে পড়াতে পশ্চিম পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের উপর করা নজরদারি আরোপ করা হয়। এমতাবস্থায় তাঁরা দুই ভাই পশ্চিম পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসেন। তাঁরা প্রতিজন ৮০০ রুপির বিনিময়ে পাঠান বা বেলুচ দালালদের সাহায্য নিয়েছিলেন গাইড হিসেবে। চুক্তি মোতাবেক তাঁদেরকে প্রথমে করাচি রেলস্টেশন থেকে রেলযোগে সিন্ধু প্রদেশের শিকারপুর আনা হয় এবং একটি হোটেলে তিনদিন রাখা হয়।[৯] ফজলুল রহিম ও আব্দুল করিম তাঁদের সাক্ষাৎকারে বলেন যে, ঐ হোটেলে তখন প্রায় ৪০০ বাঙালি অবস্থান করছিলো। পরবর্তীতে পাঠানরা তাঁদেরকে শিকারপুর থেকে রাতে বাসযোগে বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী কোয়েটাতে নিয়ে আসে। সেখানে দুই-তিন রাত একটি মাটির ঘরে লুকিয়ে রাখা হয় বাঙালিদেরকে। তারপর ভোর রাতে তাঁরাসহ প্রায় ৪০০ বাঙালিকে দু'টি কভার ভ্যানে উঠানো হয়। এসকল কভার ভ্যানে সর্বোচ্চ ৪০/৫০ জন স্বাভাবিকভাবে উঠানো সম্ভব। কিন্তু এসময় প্রতিটি ভ্যানের মধ্যে প্রায় ২০০ জন করে ঢোকানো হয়। এতে তাঁদের চরম কষ্ট হলেও ভয়ে কথা বলতে পারেননি। এ দুটি কভার ভ্যানে করে তাঁদেরকে আফগানিস্তান নোম্যান্স ল্যাণ্ডে আনা হয়। সেখানে তাঁদেরকে বেলুচরা খোরমুজা ও শুকনো রুটি খেতে দেয়। পরে বিকেলে ট্রাকে করে কান্দাহার নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

যাওয়া হয়। সেখানে পাঠানদের পরামর্শে তাঁরা কান্দাহারে ভারতীয় দূতাবাসের আঞ্চলিক অফিসে যোগাযোগ করেন। এ সময় আন্তর্জাতিক রেডক্রসের এসি বাসে করে তাঁদেরকে কাবুলে পাঠানো হয়। কাবুলে পৌছার পর ভারতীয় দূতাবাসের সহায়তায় আন্তর্জাতিক রেডক্রসের বিমানে করে লাহোরের উপর দিয়ে দিল্লিতে আনা হয়। দিল্লিতে এনে সামরিক ও বেসামরিক লোকদের দু'ভাগে ভাগ করা হয় এবং দু'টি দলকে দু'টি পৃথক হোটেলে রাখা হয়। হোটেলে অবস্থানকালে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যেসব নির্মম হত্যাকাণ্ড ও অত্যাচার চালিয়েছে তা ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে তাঁদেরকে দেখানো হয়। এছাড়া পাকিস্তান হতে পালিয়ে আসা এসব বাঙালিদের পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থানকালীন সময়ের অত্যাচারের অভিজ্ঞতা শোনা হয়। হোটেলে দুই/তিন অবস্থানের পর দিল্লিতে ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের অস্থায়ী দূতাবাসের কর্মকর্তা ড. এ.আর. মল্লিকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি প্রত্যেকের হাতে দুইশো টাকা করে এ মর্মে প্রদান করেন যে, দেশে ফিরে তাঁরা এ টাকা পাঠিয়ে দিবে। একই সাথে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে চিঠি দেওয়া হয়। রাস্তায় কোনো বিপদ হলে যেন তাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করা হয় চিঠিতে সে অনুরোধ লিখা ছিলো। পরে দিল্লি থেকে ট্রেনে কলকাতা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে বনগাঁ সীমান্ত পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে বেনাপোলে আসেন। এরপর তাঁরা বেনাপোল থেকে বিআরটিসি বাসে করে ঢাকায় আসেন।[১০] নয়াদিল্লিতে ভারত–পাকিস্তান চুক্তি সম্পাদনের ২০ দিন পর ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ হতে বন্দি বিনিময় শুরু হয়। আন্তর্জাতিক রেডক্রস এ লোক বিনিময়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে আর এতে ব্যবহৃত হয় আফগান এয়ার লাইন্স, আরিয়ানা এয়ার লাইন্সের বিমান।[১১]

কিন্তু ১৯৭৩ সালের আগে পাকিস্তানের সাথে কোনো বন্দিবিনিময় চুক্তি না হওয়াতে বাঙালিদের ফিরিয়ে আনা জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে বাঙালিদের উপর পাকিস্তান সরকার ব্যাপক নির্যাতন শুরু করে। তাদের এক শহর থেকে অন্য শহরে তো দূরে থাক বাইরে অবাধ চলাফেরা করার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা জারী করে। আটক বাঙালিরা অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে থাকে। বাংলাদেশে বিহারিদের মৃত্যুর মিথ্যা ও বানোয়াট খবর পাকিস্তানে প্রকাশের পর ১৯৭২ সালের প্রথম থেকেই প্রতিশোধ হিসেবে বিভিন্ন মহল্লায় বাঙালিদের উপর

Dhaka University Institutional Repository

হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজনকে হতাহত করে। সরকারি ও আধাসরকারি বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকুরিচ্যুত করা হয়। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা হাসান সরোয়ার সাংবাদিকদের বলেন, পাকিস্তানে বাঙালি বেসামরিক নাগরিকরা আজ অসহায় ও নিরুপায়ের মতো দিন কাটাচ্ছে। বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী বর্ণনা করে তিনি আরো বলেন যে, এদের বাঁচাতে হলে আন্তর্জাতিক রেডক্রস বা জাতিসংঘকে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করতে হবে। বাঙালিদের জন্য সাহায্যের ব্যবস্থা না করা হলে একমাসের মধ্যে ১৫ থেকে ২০ হাজার বাঙালি অনাহারে মারা যেতে পারে বলে তিনি অনুমান করেন।[১২] এমতাবস্থায় কঠোর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও কিছু কিছু বাঙালি পাকিস্তান হতে আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে আসতে শুরু করে। বাঙালিরা পালিয়ে প্রথমে কাবুল ও পরে দিল্লি হয়ে বাংলাদেশে চলে আসে। ১৯৭২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত আফগানিস্তানস্থ ভারতীয় দূতাবাসে পালিয়ে আসা ৬০০০ বাঙালি রিপোর্ট করে।[১৩] ঐ মাসেই দূতাবাস থেকে বলা হয়, এসময়ে গড়ে প্রতি সপ্তাহে ৪০০-৫০০ বাঙালি আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত দূতাবাসের মাধ্যমে আফগানিস্তান হয়ে ১০,০০০ বাঙালি দেশে ফিরে আসেন যা আন্তর্জাতিক রেডক্রসে তালিকাভুক্ত হিসাব; যদিও বাংলাদেশের বিভিন্ন উৎসে আটকেপড়া বাঙালিদের সংখ্যা চার লক্ষ দাবি করা হয়।[১৪] হিসাবের বাইরে আফগানিস্তান হয়ে কতজন দেশে ফিরে এসেছে এর কোনো সঠিক তথ্য নেই। তবে ১৯৭৩ সালের প্রথমে দিল্লি চুক্তির আগ পর্যন্ত বাঙালিদের এ পলায়ন অব্যাহত থাকে। পাকিস্তান ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে আফগান সরকারের কাছে পালিয়ে যাওয়া বাঙালিদের ফেরৎ দেয়ার অনুরোধ করলে আফগান সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে।[১৫] পাকিস্তানের সাথে ভারতের সীমান্ত সীল করে দেয়ার কারণে আটক বাঙালিদের একটি মাত্র পথ ছিলো আফগানিস্তান হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তনের। আর আফগানিস্তান বিনা শর্তে এ সুযোগ করে দেয়। শুধু তাই নয়- আফগানিস্তানে বাঙালিদের কিছু সময় থাকা-খাওয়ার জন্য রেস্ট হাউসেরও ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের যোগসূত্র ছিলো দীর্ঘ দিনের সেহেতু বাঙালি শুনলে আফগান জনগণও নিজ ব্যবস্থায় অনেক বাঙালির থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এছাড়া যুদ্ধপরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ পাওয়ার ব্যাপারেও আফগানিস্তান বাংলাদেশকে সহায়তা করে। ওআইসি, জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলন প্রভৃতি সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে আফগানিস্তান তার সমর্থন ব্যক্ত করে।

ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আফগানিস্তান, আয়ারল্যাণ্ড, মাল্টা ও চিলিসহ জাতিসংঘের আরো কিছু সদস্যদেশ বিশ্বসংস্থায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করে। সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে আলোচনাকালে আফগানিস্তানের প্রতিনিধি সিমলা সম্মেলনে ভারত ও পাকিস্তানের নেতারা যে মনোভাব ব্যক্ত করেছেন তাকে স্বাগত জানান।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন ছিলো দেশ পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই শেখ মুজিবর রহমান প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করেছিলো এবং সেই সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাহায্য সহযোগিতা কামনা করে। সদ্য পাওয়া স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় ও নিরাপদ করার জন্য বন্ধুরাষ্ট্রেরও প্রয়োজন ছিলো। এ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেছিলেন, "We are small nation and cannot fight with any body. We purshe a policy of friendship to all and malice to none. Bangladesh valued its relations with its neighbors in the region."[১৬] আর শেখ মুজিবর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়েছিলো তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকেই। এদিক থেকে বিচার করলে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান ব্যতিক্রম নয়।

দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য ১৯৭৩ সাল থেকেই বিভিন্ন প্রতিনিধি বিনিময় ও চুক্তি হতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ৩ জানুয়ারি ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. এ. আর. মল্লিক শেখ মুজিবর রহমানের বিশেষ দূত হিসেবে সর্বপ্রথম আফগান সরকারের আমন্ত্রণে কাবুল সফর করেন। তাঁর আফগানিস্তান সফর একদিকে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ ও অন্যদিকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি দানের প্রসঙ্গে (উল্লেখ্য, আফগানিস্তান তখনও বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি)।[১৭] ড. এ.আর. মল্লিক আফগানিস্তান সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের

Dhaka University Institutional Repository

একটি বাণী আফগান প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ সাদিকের হাতে হস্তান্তর করেন।[১৮] শেখ মুজিবর রহমান তাঁর বাণীতে আফগানিস্তানের প্রশংসা করেন। ড. মল্লিকের সফরের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ সাংবাদিকদের বলেন যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে দু'দেশের মধ্যে কনস্যুলেট স্থাপন হবে। ড. মল্লিকের সফরে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য কমিশন বিনিময়েরও প্রস্তাব করা হয়। অবশ্য তাঁর সফরের পরের মাসে অর্থাৎ ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৩ আফগানিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

ড. এ. আর. মল্লিক আফগানিস্তান সফরের পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালের মার্চের প্রথম সপ্তাহে আফগান প্রতিনিধি আবু আলী সুলায়মান ঢাকায় আসেন। তাঁর সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিলো বাংলাদেশে আফগানিস্তানের দূতাবাস স্থাপন। এছাড়া তার আলোচনায় যে সকল বিষয় স্থান পায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের মুক্তি, উপমহাদেশের প্রতিটি দেশের মধ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন প্রসঙ্গে আলোচনা ও দু'দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলা।

এলক্ষ্যে তিনি দু'দেশের মধ্যে একটি যৌথ বাণিজ্য কমিশন গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।[১৯] এছাড়া পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের মুক্তির ব্যাপারে আফগান সরকার কোনো নৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারবে কিনা, এ প্রশ্ন করা হলে আবু আলী সুলায়মান হ্যাঁ সূচক উত্তর দেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, এ ভূখন্ডের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের ভিত্তিতে উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, তাঁর দেশ সেটা দেখতে আগ্রহী। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উভয়ই আফগানিস্তানের বন্ধুরাষ্ট্র; তাই দু'দেশের সকল বিরোধ পারস্পারিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমাধান করলে আফগানিস্তান খুশী হবে। তিনি আরো বলেন, কাবুল ঢাকার সাথে তার সম্পর্ক আরো উন্নততর করতে খুবই আগ্রহী।[২০]

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের যে সকল যুদ্ধবন্দি ও বেসামরিক লোক পাকিস্তানে আটকা পড়ে তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোনো চুক্তি না হওয়াতে বহু লোক পালিয়ে আসতে চেষ্টা করে আফগানিস্তান হয়ে। বেশ কিছু লোক পালিয়ে আসতে সক্ষম হলেও অনেকে বিভিন্নভাবে

Dhaka University Institutional Repository

ধরা পড়ে পাকিস্তানিদের হাতে। আর এসময় আটকেপড়া বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন চালাতে থাকে। এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে পাকিস্তানের লোরালাই বন্দি শিবিরে পাঁচজন বাঙালি সামরিক অফিসারকে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঐ পাঁচজন বাঙালি অফিসার বন্দিশিবির থেকে পালাতে চেষ্টা করলে পাকিস্তানি রক্ষীরা তাঁদের গুলি করে হত্যা করে । পাকিস্তান থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা কয়েকজন বাঙালির কাছে এ খবর পাওয়া যায়। এদের মধ্যে কয়েকজন পদস্থ অফিসারও ছিলেন।

যে সকল বাঙালি আটক হন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সদস্য ও সাবেক পাকিস্তান দেশ রক্ষা দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি ব্রিগেডিয়ার খলিলুর রহমান, কর্ণেল মান্নান সিদ্দিকি, ড. মেজর নুরতজা, ড. এ আর খান।[২১] এছাড়া সাবেক পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের সদস্য মঈন চৌধুরী ও পিএসসি সদস্য বেলায়েত হোসেনও পালিয়ে আসেন। যাঁরা পাকিস্তান থেকে কোনো রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা বলেন, পাকিস্তান সরকার তখন অন্যান্য সকল সাবেক বাঙালি কর্মচারীদের বন্দি শিবিরে নিয়ে আটকানোর চেষ্টা করছিলো। করাচি থেকে পালিয়ে আসা একজন বাঙালি বলেন, পাকিস্তান নৌবাহিনীর সাবেক বাঙালি কর্মচারীদের ঘরে ঘরে আটক করে তাদের টাকা পয়সা সোনাদানা যথাসম্ভব লুণ্ঠন করে নেয়া হচ্ছিল। এছাড়া সকল আটক বাঙালির ব্যাংকে রাখা টাকা পয়সাও আটকানো হয়েছিলো।[২২] যাঁরা আফগানিস্তান হয়ে দেশে ফিরে আসছিলেন সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। কারণ পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ একথা টের পেয়ে আফগানিস্তান সীমান্তের দিকে সৈন্য সমাবেশ করে।[২৩] বেলুচিস্তান সীমান্তে পাকিস্তান সৈন্য সমাবেশ করায় বাঙালিরা আর আফগানিস্তান হয়ে ফিরে আসতে পারেননি। ১৯৭৩ সালে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় যে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয়, এসকল বাঙালি লোকজনকে উৎপীড়ন করা হয় শুধু বাঙালি বলেই। আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার কর্তৃক নিগৃহীত হয় ইহুদীরা ইহুদী বলেই।

আফগানিস্তান জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে সহায়তা করে। এপ্রিল, ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী সাংবাদিক

Dhaka University Institutional Repository

সম্মেলনে বাংলাদেশের বৃহৎশক্তির রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা নেই বলে মত পোষণ করেন। এক ঐতিহাসিক জাতীয়, মুক্তি সংগ্রামের মাঝ দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বাংলাদেশ তার এই সার্বভৌম, স্বাধীন, স্বাধীনতার সংরক্ষণ ও সংহত করার উদ্দেশ্যে জোট নিরপেক্ষ সক্রিয় নিরপেক্ষতা এবং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অবিচল থাকতে বদ্ধ পরিকর। তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংহতকরণ ও সংরক্ষণে এবং বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে আমরা নিবেদিত প্রাণ। আমরা দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক শান্তির জন্যে এ এলাকায় অবস্থিত জাতিগুলোর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করি। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে।[২৪]

১৯৭৩ সালের মে মাসে কাবুলে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টি আলোচিত হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে আলোচ্যসূচির খসড়া প্রণীত হয় কাবুলের প্রস্তুতি বৈঠকে। কাবুলের এ বৈঠকে বাংলাদেশের একটি বেসরকারি প্রতিনিধিদল ঢাকা থেকে কাবুল যায়। কাবুলের এ বৈঠকে আফগানিস্তান, আলজেরিয়া, বুরুণ্ডি, মিশর, ইথিওপিয়া, গায়ানা, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, মালয়েশিয়া, মরক্কো, সেনেগাল, শ্রীলংকা, সুদান, তানজানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, জাম্বিয়া, কম্বোডিয়া ও কিউবা বাংলাদেশের সদস্যপ্রাপ্তির ব্যাপারে বক্তব্য রাখে। আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুসা সফিক তাঁর বক্তব্যে বলেন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশ তার ন্যায়সঙ্গত ও সুযোগ্য আসন লাভ করবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের কাছে পাঠানো এক বাণীতে আফগান প্রধানমন্ত্রী এই বলে ধন্যবাদ জানান যে, কাবুলে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি কমিটির বৈঠকে বাংলাদেশকে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীভুক্ত করার সুপারিশ জানিয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি যে, বাংলাদেশকে জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীভুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ কাবুলেই নেয়া হয়েছে। আফগান প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, প্রস্তুতি কমিটির প্রস্তাব আলজিয়ার্সে আসন্ন সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যদের মধ্যে বাংলাদেশ তার ন্যায়সঙ্গত ও উপযুক্ত আসন লাভ করবে।[২৫]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশকে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যভুক্ত করার জন্য আসন্ন জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সুপারিশকে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান অভিনন্দন জানান। আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মুসা সফিকের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে তিনি জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীতে ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালনে বাংলাদেশের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেন।[২৬]

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সর্দার মোহাম্মদ দাউদ বলেন, তাঁর দেশ ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি চায়। তিনি বলেন, সুদৃঢ় সম্পর্ক, সাধারণ আদর্শই ভারত ও বাংলাদেশকে আমাদের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধন সুনিশ্চিত করে তুলেছে। স্বাধীনতা দিবসে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে সর্দার দাউদ উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৭]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশের মধ্যে ব্যবধান ছিলো অনেক বেশী। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭১ সালে নিজেদের স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিলেও যুদ্ধকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে বহু বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক লোক আটকা পড়ে। যুদ্ধ পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন বন্দিবিনিময় চুক্তি না হওয়াতে এ সকল বন্দিরা পালিয়ে আসতে থাকে। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালের ২৮ আগস্ট দিল্লি চুক্তি হলে এর বাস্তবায়ন শুরু হয় ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সালে। ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ সালে আফগানিস্তানের আরিয়ানা এয়ার লাইন্স ও রয়েল নেপালি এয়ার লাইন্স বিমানের ব্যবস্থা করেন। সিভিলিয়ান বাঙালিদের প্রথম ফ্লাইট লাহোর বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশের পথে পাড়ি জমায় ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর, বিকেল ৫টায়।[২৮]

বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে আফগানিস্তান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে সহযোগিতা প্রদান করেছিলো তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭৪ সালের পর থেকে আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হতে থাকে। দুই দেশের প্রতিনিধি গমনাগমনের মাধ্যমে এসকল চুক্তি সম্পাদিত হয়। ১৯৭৪ সালের ২৯ জুন আফগানিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ এক সরকারি সফরে বাংলাদেশে

Dhaka University Institutional Repository

আসেন। তাঁর আগমনের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে আফগানিস্তানের দ্বিপাক্ষিক কয়েকটি বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাঁর এ সফরে সঙ্গী হিসেবে ছিলেন জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ ইয়াহিয়া মারুফী ও আফগান অর্থমন্ত্রী মোহাম্মদ আজিম। তিনি তাঁর সফরকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহর দপ্তরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের সাথে দেখা করে আফগান প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ দাউদের শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দেন। এছাড়া তিনি তাঁর সফরকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন-এর সাথে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলাপ করেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরে এসেই তিনি সাংবাদিকদের বলেন, তাঁর দেশ বাংলাদেশের সাথে আরো গভীর সমঝোতা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী।[২৯] তাঁর সফরকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ১৯৭৪ সালের ৩০ জুন একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ। এ চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষ পরে আলোচনার মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ ও পণ্য তালিকা চূড়ান্ত করেন। বাণিজ্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উভয় সরকার খসড়া পণ্য বিনিময় চুক্তি সম্পাদন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে পারবে বলে এ চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়। চুক্তি অনুসারে আফগানিস্তান পাট ও পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ইত্যাদি নিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। পরিবর্তে বাংলাদেশ তুলা, সুতা, সিমেন্ট, চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি আমদানি করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে চুক্তি স্বাক্ষর শেষে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দিন দিন জোরদার হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি পাকিস্তান থেকে কাবুল হয়ে পালিয়ে আসা বাঙালিদের জন্য আফগান সরকার ও জনগণের সাহায্যের কথা স্মরণ করেন। আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ সাংবাদিকদের বলেন যে, বিভিন্ন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দু'দেশের মধ্যে আরো চুক্তি হবে।[৩০] ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ তাঁর সফরকালে বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টোর সাম্প্রতিক আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ভূট্টোকে দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, ভূট্টো কখনই নিজে কিছু ছাড়তে চান না, তিনি শুধু

Dhaka University Institutional Repository

অপরের কাছ থেকেই সুবিধা চান। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে একমত যে, ভুট্টো বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নের একটা সুযোগ হারালেন। তিনি বলেন, মানবিক ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানকে বিরাট সুবিধা দিয়েছে। বিচারের পরিবর্তে যুদ্ধ অপরাধীদের দেশে ফিরে যেতে দিয়ে বাংলাদেশ যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে তা মানবতার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, ভারতের পারমানবিক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে পাকিস্তান এক নাটকীয় প্রচারে নেমেছে। পাকতুনিস্তান আন্দোলন সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, পাকিস্তান যদি বেলুচ ও পাকতুনদের বিরুদ্ধে কোনো আক্রমণ চালায় তবে আফগানিস্তান চুপ করে বসে থাকবে না। তিনি আরো বলেন, এ দুই অংশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে আর পাকিস্তান চাইছে তাদের দমন করতে। পাকিস্তানের বুঝতে হবে যে, রাজনৈতিক বিরোধ সেনাবাহিনী দিয়ে সমাধান করা যায় না।[৩১] এছাড়াও তাঁর সফরকালে ভিয়েতনাম সমস্যা ও আরব জনগণের মুক্তির ব্যাপারে উভয় দেশ একমত পোষণ করে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তিতে উভয় দেশ পূর্বের মতো ভবিষ্যতেও একমত পোষণ করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

আফগানিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দুই দিনব্যাপী (২৯ ও ৩০ জুন, ১৯৭৪) সফর শেষে যুক্ত ইশতেহারে ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ বলেন, ড. কামাল হোসেনের সাথে তাঁর অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। তিনি ড. কামাল হোসেনের সাথে এক ঘন্টা আলোচনার পর সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করতে গিয়ে বলেন, তাঁরা পারস্পারিক সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে মত বিনিময় করেন। তিনি বলেন আমাদের উভয় পক্ষের মধ্যে অনেকাংশেই মিল রয়েছে। তাঁরা উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্প্রসারণ, সরাসরি বিমান যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আব্দুল্লাহ বলেন, যেহেতু বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান উভয়েই জোটনিরপেক্ষ দেশ তাই এ অঞ্চলে শান্তি এবং স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার প্রশ্নে তাঁরা উভয়েই ঐকমত্যে উপনীত হন। তিনি বলেন একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, সার্বভৌম সমতা এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে উভয় দেশের একই দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি আরো বলেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বশান্তি এবং সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা তথা উভয় দেশের জনগণের কল্যাণের প্রচেষ্টায় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য তাঁরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আলোচনাকে অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ বলে বর্ণনা করে ড. কামাল হোসেন বলেন, উভয় দেশই আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং বিশ্ব শান্তির জন্য কাজ করে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, উভয় দেশের মধ্যকার বর্তমান বন্ধুত্বের বন্ধন আরো শক্তিশালী হবে।[৩২] ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ তাঁর সফর শেষে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলকে যে আমন্ত্রণ জানায় তাতে সাড়া দিয়ে ১৯৭৪ সালের ২৬ আগস্ট বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ আফগানিস্তান সফরে যান। জুন মাসে সম্পাদিত বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করা ও দু'দেশের সম্পর্ক জোরদার করাই ছিলো তাঁর সফরের উদ্দেশ্য। তাঁর সাথে বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শামীম আহসান ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলীও আফগানিস্তান সফরে যান। তিনি দু'দেশের মধ্যে জুন মাসে স্বাক্ষরিত সাধারণ বাণিজ্যচুক্তি কার্যকর করার ব্যাপারে আফগান প্রতিপক্ষের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। বৈদেশিক বাণিজ্যিক মহল সূত্রে জানা যায় বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য পণ্যের মধ্যে চা আমদানি করতে আফগানিস্তান আগ্রহী। খন্দকার মোশতাক আহমদ আফগানিস্তান সফরের সময় বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আফগান জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা বাণী বয়ে নিয়ে যান। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে এ চুক্তির প্রতিফলন হিসেবে বাংলাদেশ ৭ লাখ পাউণ্ড চা রপ্তানি করে। প্রথম চালানে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা মূল্যের ১ লাখ ২০ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হয় এবং পরবর্তীতে ৮০ হাজার পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে চা রপ্তানি চলতে থাকে। ১৯৭৪ সালের বাণিজ্যচুক্তির মাধ্যমে ১৯৭৫ সালে আফগানিস্তানে পাট ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি শুরু হয়।[৩৩]

বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে সদস্যপদ লাভ করে। এ সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে ৭ জুন, ১৯৭৪ নিরাপত্তা পরিষদে জাতিসংঘের নয়া সদস্য কমিটি যে প্রস্তাব পেশ করে তারই ভিত্তিতে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হয়।[৩৪] উল্লেখ্য, মোট ৫৬টি দেশ বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির ব্যাপারে সহায়তা করে, যার মধ্যে অন্যতম ছিলো আফগানিস্তান।[৩৫]

Dhaka University Institutional Repository

নতুন প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিলো বিভিন্ন দেশের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ করা। এ উদ্দেশ্যে শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালাতে থাকেন। জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ মোটামুটি তার লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। জাতিসংঘের সদস্যপদ পাওয়ার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও প্রতিনিধির আগমন শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে আফগানিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ বাংলাদেশ সফর করেন। পরবর্তীতে ১৪ মার্চ, ১৯৭৫ তিনদিনের রাষ্ট্রীয় সফরে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী সর্দার মোহাম্মদ দাউদ ঢাকায় আসেন। বাংলাদেশে আফগান প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর এটিই প্রথম সফর। বাংলাদেশ সফর ছিলো তাঁর প্রেসিডেন্ট হবার পর দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় সফর (তাঁর প্রথম সফর ছিলো সোভিয়েত ইউনিয়ন)। তাঁর সফর সঙ্গী হিসেবে ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জালালার, পরিকল্পনা মন্ত্রী আলী আহমদ খুররম, ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ, রিচার্স এন্ড রেকর্ড এর পরিচালক গোলাম ফারুকী, প্রোটোকলের ডেপুটি প্রধান আবু আলী সোলায়মান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি আব্দুল আহাদ নাসির মিয়া, ডেপুটি কন্সুলেন্ট রিপাবলিকান ক্যাপ্টেন সাইব-জান, প্রোটোকল ডাইরেক্টরের সদস্য হাবিব উল্লাহ আনোয়ার।

আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি সর্দার দাউদের সাথে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বৈঠক করেন। বৈঠকে উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও বিশ্বের রাজনৈতিক বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা হয়। সর্দার দাউদ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, মার্কিন সরকার কর্তৃক পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং অর্থনৈতিক সমস্যাবলি সহ সকল আন্তজার্তিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি আরো বলেন, তাঁর দেশ পাকিস্তানের সাথে সে সব সমস্যা রয়েছে তার শান্তিপূর্ণ সমাধানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি বলেন, আফগান সরকারের এ মনোভাব বন্ধুরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর অন্যান্য সব রাষ্ট্রই জানে। আফগান প্রেসিডেন্ট বলেন, বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের জনগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছে সে সম্পর্কে তাঁর দেশের জনগণ সম্পূর্ণ অবহিত রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের জনসাধারণ যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট দাউদ তার প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বিদেশী শাসনের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আপনারা যে

Dhaka University Institutional Repository

সাহসের পরিচয় দিয়েছেন আমরা তার প্রশংসা করি। স্বাধীনতার জন্য আপনাদের মতো ত্যাগ ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়।" আফগান প্রেসিডেন্ট দাউদ আরো বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বহু বাঙালি সেদেশে আশ্রয় প্রার্থী হয়েছিলো এবং পাকিস্তানি কারাগার থেকে পালিয়ে বহু শরণার্থী তাঁর দেশে গিয়েছিলো। তখন আফগানিস্তান সরকার তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করেছিলো। তাদের সাহায্য সহযোগিতায় অনেক লোক দেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলো। তাই তিনি বাংলাদেশের সমৃদ্ধি কামনা করেন। প্রেসিডেন্ট দাউদ শেখ মুজিবর রহমানের সাথে আলোচনার সময় পাকতুন ও বেলুচ সমস্যা প্রসঙ্গেও কথা বলেন।[৩৬]

উক্ত আলোচনায় শেখ মুজিবর রহমান বলেন, দু'দেশের মানুষের অভিন্ন উপকার ও কল্যাণের জন্য বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সার্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করছে। জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে স্বার্থহীন কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করেন, জোটনিরপেক্ষতার মাধ্যমে শান্তি, স্বাধীকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধানকারী এক বিশ্ব গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি বলেন দাউদের সফরের মাধ্যমে দু'দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো জোরদার হবে। উপমহাদেশে একটি স্থায়ী শান্তির কাঠামো প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য পাকিস্তানি পরিবারদের ফিরিয়ে নেয়া এবং সম্পদের ন্যায্য ভাগ বাটোয়ারা সম্পর্কিত অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান অপরিহার্য। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, এসব সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার প্রতি পাকিস্তান গঠনমূলক সাড়া দেয়নি। বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিকে তাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা ও মানবতা বিরোধী জঘন্যতর হিংসাত্মক অপরাধের সুস্পষ্ট নজির থাকা সত্ত্বেও মুক্তি দিয়েছে। বেলুচিস্তান ও উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এ অঞ্চলের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আফগান সরকারের রাজনীতিসুলভ উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান। লাখ লাখ মানুষ যখন ক্ষুধা-দারিদ্র আর ব্যাধির শিকার তখন মানবতার প্রতি এটা একটা অপমান। অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা গেলে এবং সম্পদ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও মানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করলে তখনই কেবল স্থায়ী শান্তি ও মানুষের অগ্রগতি নিশ্চিত হবে। এ ধরণের ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলো কর্তৃক রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের ন্যায্য ও সঙ্গত মূল্য অত্যাবশ্যক। ধনী ও দরিদ্রের

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবধান আর বিস্তৃত না করার জন্য বাণিজ্যের শর্তাবলি উন্নয়নশীল দেশের অনুকূলে ঢেলে সাজানোর প্রয়োজন। স্বাধীনতার সময় ও পরে আফগান জনগণ ও সরকার কর্তৃক নৈতিক ও বাস্তব সমর্থন দানের জন্য রাষ্ট্রপতি আফগান রাষ্ট্রপ্রধানকে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, আমাদের বন্ধুত্ব সময়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। আমাদের দু'দেশের জনগণ ইতিহাস ও সংস্কৃতির বাঁধনে আবদ্ধ বলে আমরা সুখ-দুঃখের অংশীদার। আমাদের জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য আমরা সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশিকতাবাদ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমভাগীদার। পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার বাঙালি আফগানিস্তান ও ভারত হয়ে স্বদেশে আসার পথে দু'টি সরকার যে সাহায্য করেছে সেজন্য তিনি আফগান ও ভারত সরকারকে ধন্যবাদ জানান। নিপীড়িত ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের সংগ্রামে তাদের অধিকারের পক্ষ সমর্থন করে প্রেসিডেন্ট দাউদ ব্যক্তিগতভাবে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন সে জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৩৭]

প্রেসিডেন্ট দাউদের সফর সঙ্গী সেদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী জালালার ১৫ মার্চ বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা কালে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়ন ও আমদানি-রপ্তানির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেন, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়নে তাঁর দেশ আগ্রহী। ইতোমধ্যে পাকিস্তান বাঁধা হয়ে থাকার কারণে বাণিজ্য ক্ষেত্রে যে সমস্যা ছিলো তা খুব শিগগির দূর হবে বলে আশা করেন। পূর্বে ইরানের মাধ্যমে যে সামান্য আমদানি-রপ্তানি হতো তা অচিরেই বৃদ্ধি পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের কাঁচা তুলা, উল, শুকনো ফল ও উদ্ভিজ্জ ঔষধ রপ্তানি এবং বাংলাদেশ হতে কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য আমদানির কথা বলেন।[৩৮] বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে ১৫ মার্চ, ১৯৭৫ একটি সাংস্কৃতিক সহযোগিতা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে দু'দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠতর করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করা হয়। বাংলাদেশের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ড. মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও আফগানিস্তানের পক্ষে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহিদ আব্দুল্লাহ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিতে সংস্কৃতি, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, খেলাধূলা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করার জন্য শিক্ষক, বিজ্ঞানী, লেখক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ,

Dhaka University Institutional Repository

সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের সফর বিনিময়, বিভিন্ন বিষয়ের বই, পত্র-পত্রিকা বিনিময় ও নাটক ব্যবস্থা উন্নয়নের বিষয় উল্লেখ করা হয়।[৩৯]

আফগান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদের তিনদিনব্যাপী রাষ্ট্রীয় সফর শেষে প্রকাশিত ঢাকা-কাবুল যুক্ত ইশতেহারে উভয় দেশের মধ্যে সাহায্য সহযোগিতার ক্ষেত্র অধিকতর সম্প্রসারণের বাণীই বহন করে। ইশতেহারে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবর রহমান ও প্রেসিডেন্ট দাউদ দু'দেশের মধ্যকার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নে সর্বাধিক অবদান রাখার ব্যাপারে সংকল্পের কথা, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে একটি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ঘোষণা এবং কর্মসূচির নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশ সমূহের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থনের কথা ঘোষণা করা হয় ইশতেহারে। এছাড়া ভারত মহাসাগরকে শান্তিপূর্ণ এলাকায় পরিণত করার ঘোষণার দাবির প্রতি পুনরায় সমর্থন জানানো হয়। দক্ষিণ এশিয়ার চলতি ঘটনাবলি পর্যালোচনার পর উভয় রাষ্ট্রপ্রধান দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ অঞ্চলের জনগণের বৈধ অধিকার ও আশা আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধা ও সমঝোতা এবং পারস্পারিক সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যার সমাধানই কেবল এ অঞ্চলে একটা শান্তির পরিবেশ গড়ে তুলতে পারে। উভয় পক্ষ থেকে আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃপ্রতিম আরব জনগণের ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন ও সংহতির কথা পুনরায় ঘোষণা করে বলা হয়েছে যে, ইসরাইল কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার এবং প্যালেস্টাইনি জনগণের সার্বভৌম জাতীয় অধিকারের বাস্তবায়ন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। তাঁরা প্যালেস্টাইনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে পিএলওকে সাম্প্রতিক স্বীকৃতি দানকে অভিনন্দন জানান এবং জাতিসংঘ কর্তৃক পিএলও নেতৃবৃন্দকে বিশ্বফোরামে তাদের মতামত পেশ করার সুযোগ দানের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশ-আফগান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগ্রহী এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানের জনগণ ও সরকার অকুণ্ঠ সমর্থন সাহায্য ও সহযোগিতা করে এসেছেন। স্বাধীন হবার পর দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরো জোরদার হয়।[৪০] বন্ধুপ্রতিম দেশ হিসেবে উভয় দেশই সব সময় একে অপরের জনগণের প্রতি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৭৫ সালে আফগানিস্তানে বন্যা ও ভূমিকম্পে সে দেশের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হলে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ.এম সায়েম ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন এবং বাংলাদেশ হতে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ৫ হাজার পাউণ্ড চা সাহায্য হিসেবে পাঠান।[৪১] বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান তাদের প্রতিনিধি গমনাগমনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে প্রজাতন্ত্র দিবস ও স্বাধীনতা দিবসে শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছে। বন্যা, খরা, দুর্যোগ ইত্যাদিতে তারা পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ও সাহায্য প্রেরণ অব্যাহত রাখে। ১৯৭৫ সালে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আফগান প্রেসিডেন্ট সর্দার মোহাম্মদ দাউদের নিকট বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান বাণী পাঠান। তিনি তাঁর বাণীতে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের জনগণের পারস্পারিক স্বার্থে ফলপ্রসূ সহযোগিতার মাধ্যমে দু'টি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে বিদ্যমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। তিনি আফগান প্রেসিডেন্ট ও জনগণের সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করেন।[৪২] সে বছরই জুলাই মাসে আফগানিস্তানের দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্র দিবসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবর রহমান আফগান প্রধানমন্ত্রী সর্দার মোহাম্মদ দাউদের নিকট প্রেরিত এক বার্তায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আফগান জনগণের সমৃদ্ধি কামনা করে বলেন, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে বিরাজমান শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভ্রাতৃত্ববন্ধন ভবিষ্যতে আরো সুদৃঢ় হবে।[৪৩]

১৯৭৫ সালের ২৪ জুন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রতিমন্ত্রী কে.এম. ওবায়দুর রহমান অর্থনীতি বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক প্রতিনিধিদল নিয়ে আফগানিস্তান সফর করেন। তাঁরা এ সফরে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে কারিগরি, অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। কে. এম. ওবায়দুর রহমান আফগানিস্তানে যৌথভাবে পাটকল স্থাপনের ব্যাপারেও আলাপ করেন। উভয় দেশের নেতারা বিমান চলাচলের ব্যাপারেও

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনা করেন। কে.এম. ওবায়দুর রহমান সেদেশের অর্থমন্ত্রী খান জালালার সাথে দেখা করেন। তাঁর এ সফরকালে ২৪ জুন, ১৯৭৫ ঢাকা-কাবুল কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষে এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন কে.এম. ওবায়দুর রহমান। বাংলাদেশের এ প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ হতে আফগানিস্তানে টেলিফোন সরঞ্জাম ও ক্যাবল রপ্তানির প্রশ্নে আফগান ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী হাসান শার্কের সাথে আলোচনা করেন। এছাড়া এ সফর কালে কাবুলে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে এক বিমান চলাচল চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ বিমান ও আফগান আরিয়ানা এয়ার লাইন্স এর মধ্যে বিমান চলাচলের উল্লেখ করা হয়। এ চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কে.এম.ওবায়দুর রহমান ও আফগানিস্তানের পক্ষে সে দেশের পরিকল্পনামন্ত্রী। বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সফরের সময় অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। বাংলাদেশে উন্নতমানের ফল চাষে সহায়তা করার জন্য আফগানিস্তান হতে ফল বিশেষজ্ঞ আসবেন বলে বলা হয়। অপরপক্ষে আফগান সরকার বাংলাদেশ হতে ইংরেজির শিক্ষক, ডাক্তার ও কিছু মৎস্য বিশেষজ্ঞকে আফগানিস্তানে নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বাংলাদেশ সরকার ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল বিষয়ে আফগান ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেন। কে. এম. ওবায়দুর রহমান তাঁর সফরকালে সেদেশের প্রেসিডেন্ট সর্দার মোহাম্মদ দাউদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর সফর শেষে ঢাকা ফেরার সময় শেখ মুজিবর রহমানের জন্য আফগান প্রেসিডেন্ট দাউদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বাণী নিয়ে আসেন। এ শুভেচ্ছা বাণীতে প্রেসিডেন্ট দাউদ শেখ মুজিবর রহমানের জন্য শ্রদ্ধা প্রেরণ করে বলেন, দু'টি দেশ এক সাথে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য চেষ্টা চালাবে এবং ভবিষ্যতে দু'দেশের মধ্যকার সম্পর্ক জোরদার হবে।[৪৪]

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক প্রথম থেকেই খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ যা শুরু থেকেই আফগানিস্তান প্রমাণ করে আসছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই আফগানিস্তান বাংলাদেশকে খোলাখুলি সমর্থন দিয়েছে এবং এজন্য ইসলামাবাদের কাছে সমালোচনার সম্মুখীনও হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসা সহায় সম্বলহীন হাজার হাজার বাঙালিকে আফগানিস্তান আশ্রয় দেয়। আফগানিস্তানের সহায়তায় তারা বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তান বাংলাদেশকে সমর্থন করেছিলো। বাংলাদেশ যাতে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হতে পারে আফগানিস্তান তার জন্য কাজ করেছে। উপমহাদেশীয় সমস্যায় আফগানিস্তান বরাবরই বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে। ভারত মহাসাগরীয় শান্তির এলাকা ও নিউক্লিয়ার ফ্রি রাখার ব্যাপারে আফগানিস্তান বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়েছে। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান সব সময়ই কোনো জোটে অবস্থান করেনি।

১৯৭২-১৯৭৪ পর্যন্ত বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান একটি গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম হয়েছিলো। দু'দেশের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সরকারি দূত বিনিময়ের মাধ্যমে তারা শুধু কাছাকাছি আসেনি বরং তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকও প্রসারিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পরই আফগানিস্তান থেকে ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ, শিল্পমন্ত্রী আব্দুল মজিদ বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও অর্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও বাংলাদেশ কর্তৃক ভারতে নিযুক্ত হাই কমিশনার এ. আর. মল্লিক আফগানিস্তান পরিদর্শন করেছিলেন। তাঁদের সফরে ঢাকা ও কাবুলের মধ্যে অর্থনীতি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী যে সকল পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিলো তা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা যায়। জুন, ১৯৭৪ আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহর সফরের সময় দু'দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি উভয়দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক পদক্ষেপ। ১৪ মার্চ, ১৯৭৫ আফগান প্রেসিডেন্ট দাউদের বাংলাদেশ সফরের সময় যে সব আলাপ আলোচনা ও চুক্তি হয় তাতে দেশ দু'টি তাদের বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করে।

১৫ মার্চ, ১৯৭৫ সাংস্কৃতিক চুক্তির পথ ধরেই দু'দেশের মধ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মীর গমনাগমন শুরু হয়; ফলে বাংলাদেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে যোগ হয় নতুন মাত্রা। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন শিল্পীরা যেমন আফগানিস্তান গিয়েছে তেমনি আফগানিস্তান থেকেও চলচ্চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

অভিনেতা, বিভিন্ন শিল্পীর আগমন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশে নির্মিত চলচ্চিত্র বন্দিনী এর নাম উল্লেখ করা যায়। এ চলচ্চিত্রে বাংলাদেশের স্বনামধন্য নায়িকা ববিতার বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন আফগান নায়ক ওয়াহিদ। এ ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথাই ঘোষণা করে।[৪৫]

(খ) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান: অর্থনৈতিক সম্পর্ক

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে তার স্বীকৃতি অর্জন ও আটক বাঙালিদেরকে ফেরত আনা, বিষয় দু'টি নিয়ে বেশ কালক্ষেপণ করতে হয়। আবার যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনও এ সময় আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জারের ভাষায়, এ সময় বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে Bottomless Busket বা তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়। এ অবস্থা উত্তরণে বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন। এ সময় আফগানিস্তান নামক বন্ধু রাষ্ট্রটি শুধু বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে ও আটক বাঙালিদের দেশে ফিরতে সহায়তা করেই ক্ষান্ত হয়নি। ১৯৭২ থেকে শুরু হয় বাংলাদেশ-আফগানিস্তান প্রতিনিধি বিনিময় ও শুভেচ্ছা সফর। বাংলাদেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে ১৯৭৩ এর শুরুতেই আফগানিস্তানের শিল্পমন্ত্রী আব্দুল মজিদ বাংলাদেশ সফরে আসেন। বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও অর্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ আফগানিস্তান যান। তাঁদের সফরে ঢাকা ও কাবুলের মধ্যে অর্থনীতি বিষয়ক স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৭৩ এর জুন মাসে আফগানিস্তান হতে ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ একটি বাণিজ্য বিষয়ক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাংলাদেশে আসেন। এ চুক্তিকে কার্যকর করার জন্য ১৯৭৪ এর ২৬ আগস্ট বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শামীম আহসান ও বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আলী আফগানিস্তান যান। ১৯৭৪ এর এই বাণিজ্য চুক্তি আরও অধিকতর কার্যকর হয় ১৪ মার্চ, ১৯৭৫ আফগান প্রেসিডেন্ট সর্দার দাউদের বাংলাদেশ সফরের মাধ্যমে। ১৯৭৫ হতে আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে আমদানির পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

বাড়তে থাকে। বাংলাদেশ থেকে এ সময় আফগানিস্তানে রপ্তানি হতো কাঁচা তুলা, উল, শুকনো ফল ও উদ্ভিজ্জ ঔষধ, কাগজ, নিউজপ্রিন্ট ও ভোগ্যপণ্য।[৪৬]

সারণি- ১

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের আমদানি-রপ্তানি (১৯৭২-১৯৭৫)

অর্থ বছর	আমদানি পণ্যের মূল্য (লক্ষ টাকায়)	রপ্তানি (হাজার টাকায়)
১৯৭২-৭৩	---	৪.১৯
১৯৭৩-৭৪	---	১৪.৯০
১৯৭৪-৭৫	---	২৮.৩৯
১৯৭৫-৭৬	---	১০২০১

উৎস: Annual Export Receipts, 1978-79, Statistics Department, Bangladesh Bank, P.P. 130-131. Annual Import Payment, 1987-88, Statistics Department, Bangladesh Bank, P. 91.

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান উভয়ই জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আফগানিস্তান আমাদের সহায়ক বন্ধু রাষ্ট্র ছিলো। ১৯৭২ সালের শেষ দিকে ইকবাল আতাহার বাংলাদেশ থেকে প্রথম কাবুল সফর করেন এবং এর পরই বাংলাদেশ কর্তৃক নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার এ. আর. মল্লিক ১৯৭৩ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ১০ জানুয়ারি আফগানিস্তানে এক বিশেষ সফর করেন।

১৯৭৩ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে আফগানিস্তান স্বীকৃতি দেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বহু বাঙালি পাকিস্তান হতে আফগানিস্তান হয়ে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে। পাকিস্তান হতে যে সব বাঙালিরা পালিয়ে আফগানিস্তান গিয়েছিলো তাদেরকে আফগান সরকার খাবার, আশ্রয় ও সাহায্য-সহযোগিতা দিয়েছিলো। প্রথম থেকেই আফগানিস্তান জাতিসংঘ ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের সদস্যপদ পাবার ব্যাপারে জোর কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।

১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশ কাবুলে মিশন স্থাপন করে এবং প্রায় একই সময়ে কাবুলও ঢাকায় তার মিশন স্থাপন করে। আফগানিস্তানের ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ এক সফরে ঢাকা আসেন ২৯ জুন, ১৯৭৪। তিনি ৩০ জুন, ১৯৭৪ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ সময়ই বাংলাদেশের সাথে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৪ সালের ২৮ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ আফগানিস্তান সফর করেন। এসময় তিনি দু'দেশের অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলাপ করেন। আফগানিস্তান সফরে গিয়ে তিনি প্রেসিডেন্ট দাউদের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। আফগানিস্তান এসময় বাংলাদেশ থেকে পাটজাত দ্রব্য, কাগজ ও অন্যান্য পণ্য আমদানির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭২ সাল থেকে আফগানিস্তানের সাথে কূটনৈতিক যোগাযোগের শুরু হয়। ১৯৭৪ সালে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি হয়। ১৯৭৪ সালের পর থেকে এ সকল বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায় দু'দেশ পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন পণ্য আমদানি-রপ্তানি শুরু করে। বিভিন্ন আমদানি-রপ্তানি ছাড়াও বিশেষ পর্যায়ে মেধার আদান প্রদানও শুরু হয় এবং শিল্পী, বিজ্ঞানী, কৃষিবিদ, ডাক্তারসহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের যাতায়াত শুরু হয়। চুক্তির মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে বিমান যোগাযোগ শুরু হয় এবং এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। ১৪ মার্চ, ১৯৭৫ আফগান প্রেসিডেন্ট সর্দার মোহাম্মদ দাউদের বাংলাদেশে আগমন ও বাংলাদেশের প্রতিনিধি কে.এম. ওবায়দুর রহমানের আফগানিস্তানে গমন (জুলাই, ১৯৭৫) এর মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ পরিপূর্ণতা লাভ করে। এরই মধ্যে ১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ শেখ মুজিবর রহমানের অকাল মৃত্যুতে দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পরবর্তীকালে কিছু সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করার কারণে আফগানিস্তান সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে সম্পর্কের ভাটা পড়ে।

বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ শেখ মুজিবর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর দেশের কর্ণধার হিসেবে তিনি পররাষ্ট্র বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ তখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিকসহ বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। অন্যদিকে মাত্র দু'একটি দেশের স্বীকৃতি ব্যতিরেকে বিশ্বের মুসলিম দেশসহ অন্যান্য দেশের স্বীকৃতি মেলেনি। তাই শেখ মুজিবর রহমান পররাষ্ট্র নীতি হিসেবে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে শত্রুতা নয় নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে যোগাযোগ শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় শেখ মুজিবর রহমানের সময় আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের উষ্ণ সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামলে দু'দেশের মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময় ও

Dhaka University Institutional Repository

বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক যোগাযোগ শুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে।

তথ্য নির্দেশ

১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬), পৃ. ১৪

২. *Pakistan Horizon* (Karachi), Vol. XXVI, No- 1, first Quarter, 1973, p. 80

৩. ভবেশ রায়, *বঙ্গবন্ধুর জীবন কথা* (ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেসন, ১৯৯৪), পৃ. ২২২

৪. *দৈনিক বাংলা*, ১১ অক্টোবর, ১৯৭২

৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ আগস্ট, ১৯৭২

৬. *দৈনিক বাংলা*, ১৩ নভেম্বর, ১৯৭২

৭. ফখরুদ্দিন আহমেদ, *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলি : এক দক্ষিণ এশীয় কূটনীতিকের স্মৃতিকথা* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৮৫- ৮৭

৮. লে. কর্ণেল (অব.) এম এ হামিদ, পিএসসি, *পাকিস্তান থেকে পলায়ন* (ঢাকা: মোহনা প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ১০, ২৪, ২৭, ৩২, ৩৬, ৫০, ৫৫, ৭১

৯. একান্ত সাক্ষাৎকার, ফজলুর রহিম, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি চিফ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, তারিখ: ০৫/১০/২০০৭

১০. একান্ত সাক্ষাৎকার, আব্দুল করিম, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী বাংলাদেশ নৌবাহিনী, তারিখ: ০৩/১০/২০০৭

১১. *দৈনিক বাংলা*, ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩

১২. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ আগস্ট, ১৯৭২

১৩. *Facts on File*, Vol. XXXII, No 1672, 12-18 November, 1972, p. 919

১৪. *The Daily Dawn*, (Karachi), 14 April, 1973

১৫. Fakruddin Ahmed, *Critical Times Memories of a South Asian Diplomat* (Dhaka: UPL, 1994), pp. 86-87

১৬. P. K. Mishra, *India, Pakistan, Nepal and Bangladesh* (New Delhi: Sandeep Prakashani, 1979), p.159

১৭. *দৈনিক স্বদেশ*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩

১৮. *দৈনিক সমাজ*, ২০ জানুয়ারি, ১৯৭৩। আরও দ্রষ্টব্য : এ.আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১২৭

১৯. *The Bangladesh Observer*, 2 March, 1973

২০. *দৈনিক সংবাদ*, ৩ মার্চ, ১৯৭৩

Dhaka University Institutional Repository

২১. মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (অবঃ), *পূর্বাপর ১৯৭১, পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫), পৃ. ১৩৯, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৮, ১৫৩

২২. *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩

২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ এপ্রিল, ১৯৭৩। আরও দ্রষ্টব্য: The Bangladesh Observer, 10 April, 1973

২৪. *দৈনিক বাংলা*, ১১ এপ্রিল, ১৯৭৩

২৫. The Bangladesh Observar, 20 May, 1973

২৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৯ মে, ১৯৭৩

২৭. *দৈনিক বাংলা*, ২৫ আগস্ট, ১৯৭৩

২৮. নূর হাসনা লতিফ, *পাকিস্তানে আটকেপড়া দিনগুলি* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯০), পৃ. ৫৩-৫৪

২৯. *দৈনিক বাংলা*, ৩০ জুন, ১৯৭৪

৩০. Rabindranath Trivedi, *International Relations of Bangladesh and Bongobandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol. II, (Dhaka: Parma, 1999), pp. 198-200

৩১. *দৈনিক সংবাদ*, ১ জুলাই, ১৯৭৪

৩২. *দৈনিক সমাজ*, ৩ জুলাই, ১৯৭৪। আরও দ্রষ্টব্য: *The Bangladesh Times*, 30 June, 1974

৩৩. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১১মে, ১৯৭৫

৩৪. Nurul Momen, *Bangladesh in the United Nation*, (Dhaka: UPL, 1987), p. 25

৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

৩৬. *The Morning News*, 15 March, 1975

৩৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭৫

৩৮. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মার্চ, ১৯৭৫

৩৯. The Bangladesh Observer, 16 March, 1975

৪০. *দৈনিক বাংলার বাণী*, ১৮ মার্চ, ১৯৭৫। আরও দ্রষ্টব্য: *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৮ মার্চ, ১৯৭৫

৪১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ মে, ১৯৭৫

৪২. *দৈনিক বাংলা*, ২৭ মে, ১৯৭৫

৪৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ জুলাই, ১৯৭৫। আরও দষ্টব্য: *The Bangladesh Times*, 17 July, 1975

৪৪. *The Bangladesh Observer*, 28 June, 1975.

৪৫. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, চতুর্থ বর্ষ, ২৭ হতে ৩৮ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৭৫ – ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬

৪৬. *Monthly Export Receipt*, March 1974, December 1975, Statistics Department (Dhaka: Bangladesh Bank), pp. 15, 21

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক : জিয়া আমল (১৯৭৫-১৯৮১)

(ক) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : রাজনৈতিক সম্পর্ক

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর মুজিব সরকারের পতন হয় এবং খোন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে একটি দক্ষিণপন্থী সরকার ক্ষমতাসীন হয়। এ পরিবর্তন শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরপর থেকেই ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ মস্কো-দিল্লি অক্ষের প্রভাব থেকে দ্রুতগতিতে বেরিয়ে আসে এবং পশ্চিমা বিশ্ব, ইসলামি বিশ্ব ও চীনের সাথে ঘনিষ্টতর হবার চেষ্টা করে। বাংলাদেশ বেতারে সামরিক বাহিনীর এক ঘোষণায় বলা হয় যে, বাংলাদেশের নাম "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" পরিবর্তন করে "বাংলাদেশ ইসলামি প্রজাতন্ত্র" করা হবে। অবশ্য পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে যে, এ ঘোষণা কতিপয় সামরিক কর্মকর্তার তাৎক্ষণিক খেয়াল ছিলো মাত্র, সুনির্দিষ্ট কোনো গতি নয় এবং রাষ্ট্রের নামও পরিবর্তন করা হয়নি।

কিন্তু পরবর্তী সময়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর রাষ্ট্রীয় নীতিতে উপরোক্ত বেতার ঘোষণার বাস্তাবায়ন সদৃশ কিছু পরিবর্তন হয়। ১৯৭৭ এর সংবিধান সংশোধনের সূচনায় বলা হয়, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" এবং ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে যুক্ত হলো "সব কাজের ভিত্তি হিসেবে আল্লাহর প্রতি আস্থা"।[১] তদুপরি ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন সাংবিধানিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৭৬ এ জিয়াউর রহমান ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ ইসলামি রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ট করতে চায়। কারণ তাদের সঙ্গে আমাদের ধর্মীয়, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন আছে।[২] জিয়াউর রহমান আরো বলেন, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছি তবে এক্ষেত্রে আমাদের 'ইসলামি নেচার' সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ন রেখেই তা করা হচ্ছে।[৩] জিয়াউর রহমানের বৈদেশিক নীতি ছিলো অনেকটা ভারত, সোভিয়েত বিরোধী এবং আমেরিকা ও ইসলামি বিশ্ব ঘেঁষা। তবে তিনি বৈদেশিক নীতিতে এ পরিবর্তন এনেছিলেন দেশের তৎকালীন পরিস্থিতি বিবেচনা করেই।[৪]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৫-১৯৮১ সময়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষণ করলে ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্পর্কের দিকটি বেশ লক্ষ্য করা যায়। জিয়াউর রহমান এ সময়ে আকস্মিক কোনো পরিবর্তন আনেননি। শেখ মুজিবর রহমান যা করতে চেয়েছিলেন বা যা শুরু করেছিলেন তা জিয়াউর রহমান সুপরিকল্পিতভাবে বেশ কিছুদূর এগিয়ে নিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এ সময়ে শ্লথ গতিতে হলেও সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধন নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

বিশ্বের ইতিহাসে আবির্ভূত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকে। শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামলে অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিলো অর্থনৈতিক পুনর্গঠনসহ বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের সূচনা করা। তিনি সকলের সাথে বন্ধুত্বের নীতি অবলম্বন করে একদিকে যেমন বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা চালিয়েছিলেন তেমনি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাজনীতিসহ আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করে দেশে একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি আনায় সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পর (১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট) দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে একটি খণ্ডকালীন সময়ের জন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে স্থবির অবস্থা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এ স্থবির অবস্থা দীর্ঘদিন টিকে থাকেনি। সেই স্বল্পকালীন সময়ে যদিও বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্থবির অবস্থা লক্ষ্য করা যায় কিন্তু দেশটির (আফগানিস্তান) সাথে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক যোগাযোগসহ দূত ও পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে পূর্বের (শেখ মুজিবর রহমানের) নীতির ব্যত্যয় ঘটেনি।

১৯৭৬ সালের মে মাসে আফগানিস্তানে এক প্রলয়ংকারী বন্যা হয়। এতে বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বিচারপতি এ.এম সায়েম তাঁর এক বাণীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত আফগান জনগণের জন্য প্রেসিডেন্ট দাউদের কাছে গভীর সমবেদনা জানান। বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানের ভূমিকম্প ও বন্যায় ক্ষতির জন্য ৫,০০০ পাউণ্ড প্রদান করে।[৫] সমসাময়িক সময়ে বাংলাদেশেও বন্যার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। বাংলাদেশের বন্যাদুর্গত জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

করে আফগান রেডক্রিসেন্ট প্রধান বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সমিতির চেয়ারম্যান বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকীর নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করেন।[৬]

আফগানিস্তানের তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বিচারপতি এ.এম সায়েম প্রেসিডেন্ট দাউদের কাছে প্রেরিত এক বাণীতে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে গভীর সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের জনগণকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।[৭] আফগানিস্তানের প্রজাতান্ত্রিক দিবস উপলক্ষ্যে বিখ্যাত শিল্পী ফেরদৌসি রহমান ও বেদারুদ্দিন আহমেদসহ ছয়জন সংগীত শিল্পী বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হিসেবে আফগানিস্তানে গমন করেন। তাঁরা কাবুলের নান্দারি হল ও গাজী স্টেডিয়ামে সংগীত পরিবেশন করেন। তাঁদের আফগানিস্তান গমন ও সংগীত পরিবেশন আফগান-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বেরই সাক্ষ্য বহন করে।[৮]

১৯৭৫ সালের জুন মাসে স্বাক্ষরিত কারিগরি সহযোগিতা চুক্তির অধীনে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান যৌথ কমিশন গঠিত হয়। কিন্তু এর অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিবর রহমানের আকস্মিক মৃত্যু দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে কিছুটা হলেও অস্থিতিশীল করে দেয়। কিন্তু এ পরিস্থিতি স্থায়ী হয়নি। ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে আফগান পক্ষে আফগানিস্তানের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা বিভাগের প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ নবী সালেহী এবং বাংলাদেশের পক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচির প্রধান এম. মহীউদ্দিন নেতৃত্ব করেন। উভয়পক্ষ কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি বাস্তবায়নে ২ বছরের কার্যক্রমের বিষয়াবলির ওপর মত বিনিময় করেন।[৯]

আফগানিস্তানের বাণিজ্য উপমন্ত্রী হামিদুল্লাহ টারজি এর নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে চারদিনের সফরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা আসেন। দু'দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষর করার জন্য আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এ সফরে আসেন। আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতা বলেন, এ চুক্তি

Dhaka University Institutional Repository

স্বাক্ষরের মাধ্যমে দু'দেশের মধ্যে ঘনিষ্ট বাণিজ্যিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার সূচনা হবে। সফররত আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা হামিদুল্লাহ টারজি রাষ্ট্রপতির বাণিজ্য উপদেষ্টা এম সাইফুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন। তাঁরা দু'দেশের মধ্যে বিদ্যমান বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। আফগানিস্তানের বাণিজ্য উপমন্ত্রী হামিদুল্লাহ টারজিকে স্বাগত জানিয়ে সাইফুর রহমান বলেন, আফগানিস্তান ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে পাটজাত পণ্য, চা, কাগজ, দিয়াশলাই, রেয়ন ইত্যাদি আমদানি করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে আফগানিস্তান বাংলাদেশ থেকে আরো কতিপয় পণ্য আমদানি করবে। এ ব্যাপারে তিনি পণ্যের একটি তালিকাও প্রণয়ন করেন। প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে দু'দেশের মধ্যে পণ্য বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষরের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন বাণিজ্য সচিব এম. মতিউর রহমান ও আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন সেখানকার উপ-বাণিজ্য মন্ত্রী হামিদুল্লাহ টারজি। দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব কে.এম মমিনুল হক এবং আফগানিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের প্রধান গোলাম হোসেন রিয়াজের নেতৃত্বে একটি যৌথ ওয়াকিং গ্রুপ গঠন করা হয়।

১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির পথ ধরেই বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের কর্মকতাগণ ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি খসড়া বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করেন। চুক্তিটি যৌথভাবে প্রস্তুত করেন বাণিজ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব চৌধুরী এ.কে. এম আমিনুল হক ও আফগানিস্তানের বাণিজ্য দপ্তরের বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের প্রধান গোলাম হোসেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১ মার্চ, ১৯৭৭। বাণিজ্য সচিব এম. মতিউর রহমান এবং আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা হামিদুল্লাহ টারজি নিজ নিজ দেশের পক্ষে প্রটোকলে স্বাক্ষর দান করেন। প্রটোকলের অধীনে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান প্রত্যেক বছরে ২৫ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য বিনিময় করবে। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানে পাটজাত দ্রব্য, রেয়ন, চা, নিউজপ্রিন্ট কাগজ ও মনোহারী সামগ্রী, দিয়াশলাই, চিনি, তাঁত শিল্পজাত সামগ্রী, তার, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, আনারস সহ তাজা ফলমূল, মশলা ও হার্ডবোর্ড রপ্তানি করবে এবং আফগানিস্তান থেকে আমদানি করবে তুলা, তাজা শুষ্ক ফলমূল, ঔষধি, পশমি দ্রব্যাদি, মার্বেল চিপস ও হস্তশিল্পজাত পণ্য সামগ্রী।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে ৫ দিন সফরশেষে ৩ সদস্যের আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতা হামিদুল্লাহ টারজি বলেন, রপ্তানির জন্য বাংলাদেশের পণ্যের মান খুব ভালো ও উঁচু এবং তা আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি বলেন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে, মান রক্ষিত হয়েছে এবং আমাদের বন্ধুদেশ বাংলাদেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ এবং আফগানিস্তানের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার সম্ভাবনা সম্পর্কে আফগান মন্ত্রী বলেন, এর সম্ভাবনা খুব উজ্জল এবং ভবিষ্যতে নিশ্চিতভাবেই বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দু'দেশের মধ্যে নেতা, কর্মকর্তা বিনিময় অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে চুক্তি বহির্ভূত পণ্য বিনিময় বাণিজ্যও হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন যে, ঢাকা এবং কাবুলের মধ্যে বিমান যোগাযোগ স্থাপিত হলে তা পর্যটন ও সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং দু'দেশের মধ্যে পণ্য পরিবহনে সহায়ক হবে।[১০]

১৯৭৭ সালে সি এম মোর্শেদ আফগানিস্তানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আফগানিস্তানে গমন করেন। তিনি তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করার সময় প্রেসিডেন্ট দাউদ বলেন যে, তাঁর সরকার দু'দেশের মধ্যকার ভ্রাতৃসূলভ সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করবেন।[১১]

এদিকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি স্থিতিশীল সরকার গঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকটা শেখ মুজিবর রহমানের অনুসৃত নীতিই অবলম্বন করেন। তবে তিনি ইসলামি বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বারোপ করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি সায়েম ১৯৭৬ সালের ২৯ নভেম্বর মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করেন। রাষ্ট্রপতি সায়েম কেবল বে-সামরিক উপাধিসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর পদে বহাল থাকেন। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানই প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। ১৯৭৭ সালের ২৯ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি সায়েম পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর সকল ক্ষমতা মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের নিকট হস্তান্তর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসেই রাষ্ট্রের মূলনীতি ও সংবিধানের কতিপয় ধারায় পরিবর্তন আনেন এবং এটা তাঁর মুসলিম বিশ্বের প্রতি ঝুঁকে পড়ার সতর্ক কুটনীতিই বলে অভিহিত করা যায়। তিনি অপরাপর মুসলিম দেশের ন্যায় আফগানিস্তানের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। ফলে শেখ মুজিবর রহমানের সময়ে সৃষ্ট আফগান-বাংলাদেশ ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের কোনো ভাটা পড়েনি।

৯ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ আফগানিস্তানের যোগাযোগ উপমন্ত্রী আজিজুল্লাহ জহিরের নেতৃত্বে দু'সদস্য বিশিষ্ট সরকারি প্রতিনিধিদল পাঁচ দিনের সফরে বাংলাদেশে আসেন। এখানে প্রতিনিধি দলটি শিল্প ও বাণিজ্যিক বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন। এখানে অবস্থানকালে তাঁরা টঙ্গি টেলিফোন ফ্যাক্টরি ও খুলনা ক্যাবল ফ্যাক্টরি পরিদর্শন করেন।[১২]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পালাবদলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে যেমন বহির্বিশ্বের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে সচেষ্ট হন, তেমনি পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় আফগানিস্তানের দিক থেকেও ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ হিজরি নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে প্রেরিত বাণীতে বাংলাদেশের জনগণের কল্যাণ কামনা করেন এবং দু'দেশের জনগণের মঙ্গল কামনা করেন।

428195

১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ আফগানিস্তানের শিল্প ও খনিজ দপ্তরের মন্ত্রী আব্দুল তোয়াব আসেকি ৪ দিনের সফরে ঢাকা আসেন। আসেকি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রত্যক্ষ করা এবং বাংলাদেশের বন্ধু ও ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের সাথে মিলিত হওয়া তাঁর এ সফরের মূল উদ্দেশ্য। তিনি বলেন, আপনাদের মতো আমাদের দেশও উন্নয়নশীল এবং পারস্পরিক স্বার্থেই আমরা একে অপরের সাফল্য ও সমস্যাবলি জানতে চাই। বাংলাদেশে অবস্থানকালে আফগান শিল্পমন্ত্রী দর্শনা চিনি কল, চিটাগাং স্টিল মিলস ও কর্ণফুলী পেপার মিল পরিদর্শন করেন। তিনি বাংলাদেশ সরকারের শিল্প বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব জামাল উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে আফগানিস্তানে এক সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন আফগান প্রেসিডেন্ট সর্দার দাউদ এবং ক্ষমতায় আসেন রেভ্যুলশনরী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তারাকী। এর অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশে নিযুক্ত আফগানিস্তানের প্রথম রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আনোয়ার কাকার প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি আফগান প্রেসিডেন্ট নূর মোহাম্মদ তারাকীর শুভেচ্ছা বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের কাছে হস্তান্তর করেন। তিনি দু'দেশের মধ্যে গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, দু'দেশই জাতিসংঘ সনদ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে ভবিষ্যতে এ সম্পর্ক আরো উন্নত হবে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বলেন, তাঁর সরকার আফগান রাষ্ট্রদূতকে তাঁর দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান ভ্রাতৃসুলভ সম্পর্কের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার নূর মোহাম্মদ তারাকীর নেতৃত্বাধীন নতুন আফগান সরকারের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেন ঢাকাস্থ আফগান দূতাবাসের কাছে।[১৪]

ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও আইন লংঘন করে আকস্মিকভাবে আফগানিস্তানে রাশিয়ার সৈন্য প্রেরণ পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র, বিশেষ করে ইসলামি বিশ্ব ও আমেরিকাসহ সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব হতবাক ও বিস্মিত হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ও অযৌক্তিকতায় সকলেই তখন দ্বিধাগ্রস্থ। এহেন পরিস্থিতি আফগানিস্তানের বন্ধু রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিলো চাঞ্চল্যকর ও উল্লেখযোগ্য।

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেন, এশিয়ার জোটনিরপেক্ষ এ দেশটির সাম্প্রতিক ঘটনাবলিতে বাংলাদেশ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং সেখানে সোভিয়েত সৈন্যদের উপস্থিতি ও সে দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে তাদের সরাসরি হস্তক্ষেপ এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে।[১৫] বাংলাদেশ আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য আহ্বান জানায় যাতে বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ বা বাঁধা ছাড়া আফগান জনগণ তাঁদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরা নির্ধারণ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য সরাসরি কোনো হুমকি সৃষ্টি না করলেও বিষয়টি এ অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে বলে বাংলাদেশ মনে করে। এছাড়া বিষয়টি মানবতা বিরোধী ও জাতিসংঘ সনদের পরিপন্থী।[১৬]

১৯৮০ সালের ২৬-২৮ জানুয়ারি আফগান ইস্যুটি আলোচনার জন্য ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোঃ শামসুল হক অধিবেশনে যোগ দেন। অধিবেশনে তিনি বলেন, আফগানিস্তানে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তনীয় বিষয় ও ব্যথার কারণ। বাংলাদেশ আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও যথার্থ অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট এবং কোনো রকম বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ছাড়া আফগান জনগণ যাতে নিজেরাই নিজেদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করতে পারে বাংলাদেশ প্রতিনিধি তার স্বপক্ষে বক্তব্য তুলে ধরেন।

১৯৮০ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৫তম অধিবেশনে আফগান ইস্যুটি প্রথমবারের মতো স্থান পায়। বাংলাদেশসহ জাতিসংঘের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বক্তব্য ও নীতিমালার তীব্র বিরোধীতা করে। অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি কম্পুচিয়া ও আফগানিস্তানের উল্লেখ করে বলেন, কোনো রকম বৈদেশিক হস্তক্ষেপ ও শর্ত ছাড়া এ দু'টি দেশের জনগণকে নিজেদের সরকার গঠন ও ভাগ্য নির্ধারণ করার সুযোগ দেয়া হোক।[১৭]

আফগানিস্তানে যে ঘটনা ঘটেছে শান্তিকামী প্রতিটি দেশের কাছে তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সেদেশে গত দুই বছর পর পর সামরিক অভ্যুত্থান, রক্তপাত ও বিদ্রোহের ফলে সেখানকার রাজনৈতিক অস্থিরতা ও স্থিতিহীনতা বিরাজ করছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত উপস্থিতি নিঃসন্দেহে জাতিসংঘ সনদের বরখেলাপ হয়েছে। আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ ঐ দেশটির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ক্ষুণ্ন করেছে এবং এশিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে বলে বাংলাদেশ মনে করে।

Dhaka University Institutional Repository

জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রতিটি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা পোষণ করে এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে দৃঢ়তার সাথে আস্থাশীল। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ঐ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব লংঘনের শামিল এবং প্রত্যেকটি জাতিরই কোনো প্রকার বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে নিজেদের সরকার, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা বেছে নেবার অধিকার আছে।[১৮]

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন গোটা বিশ্বকে হতবাক করে দেয়। এজন্য বিষয়টি জাতিসংঘে আলোচনার দাবি রাখে। জাতিসংঘে ৫ জানুয়ারী, ১৯৮০ সোভিয়েত হস্তক্ষেপের বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। আফগানিস্তান পরিস্থিতির উপর যে সব প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন তাঁদের অধিকাংশই আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। জাতিসংঘের সদস্যভুক্ত ৫১টি রাষ্ট্রের অনুরোধে নিরাপত্তা পরিষদে আফগান পরিস্থিতির উপর এ বিতর্ক হয় যার মধ্যে অন্যতম দেশ বাংলাদেশ। নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধি যুক্তি দেখান যে, আফগানিস্তানের উপর আলোচনা করার অধিকার পরিষদের নেই। এটা করে পরিষদ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে।[১৯]

চারটি জোট নিরপেক্ষ দেশ আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব পেশ করে। বাংলাদেশ, নাইজার, জাম্বিয়া ও ফিলিপাইন এ প্রস্তাব পেশ করে। এসব দেশের প্রতিনিধিরা এ প্রস্তাব করেছেন যে, প্রস্তাব বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল দু'সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন। আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক সশস্ত্র হস্তক্ষেপ প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংরক্ষণ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদের মৌল নীতির পরিপন্থী হওয়ায় এ হস্তক্ষেপের নিন্দা করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[২০]

ভ্রাতৃপ্রতিম দু'টি মুসলিম দেশ আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের যোগাযোগ হাজার বছর ধরে। দু'টি মুসলিম দেশের ভাষাগত ও জীবনপ্রণালীতে রয়েছে প্রচুর অমিল। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধের

Dhaka University Institutional Repository

বাঁধনে তারা একে অপরের পরম বন্ধু। প্রতিবেশী মুসলিম দেশ দু'টি সব সময়ই একে অপরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দেশ দু'টির রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শুধু রাজনৈতিক সম্পর্কই বিদ্যমান ছিলোনা, বরং এক দেশের জনগণের সাথে অপর দেশের জনগণও সব সময় একাত্মতা ঘোষণা করেছে আর তারই প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে। আফগানিস্তানে রুশ আক্রমণে শুধু সরকার পর্যায়েই সমালোচিত হয়নি বরং তখন প্রধান বিরোধীদলসহ সকল রাজনৈতিক দল ও সমাজসেবী সংগঠনগুলো তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছে তাঁদের বক্তব্য ও কর্মে।

৩ জানুয়ারি, ১৯৮০ ঢাকা আইনজীবী সমিতির পক্ষ থেকে বলা হয় বারবাক কারমাল কর্তৃক আফগানিস্তানে তথাকথিত অভ্যুত্থান ক্রেমলিনের নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের এক অভিনব পন্থা। এ সভার পক্ষ থেকে আফগান জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে অবিলম্বে সকল রুশ সৈন্যের অপসারণ দাবি করে। বাংলাদেশ আইনজীবী সমিতি এ বিষয়ে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে।[২১]

আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যের উপস্থিতির প্রতিবাদ স্বরূপ ২ ও ৩ জানুয়ারি, ১৯৮০ ঢাকা শহরে বিক্ষোভ মিছিলো ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুসলিম লীগ প্রধান খান এ সবুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক আফগানিস্তানের ওপর নির্লজ্জ সামরিক হামলার তীব্র নিন্দা এবং অবিলম্বে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[২২] জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির এক সভায় আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যের উপস্থিতির তীব্র নিন্দা করা হয়। ডেমোক্রেট শ্রমিকলীগ, কৃষকলীগ, যুব ফ্রন্ট ও গণতান্ত্রিক ছাত্রলীগের যৌথ উদ্দ্যোগে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে আফগানিস্তানে রুশ হামলার প্রতিবাদে গণ-জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়।[২৩] ফারাক্কা ও সীমান্ত হামলা প্রতিরোধ কমিটি এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের নগ্ন আগ্রাসন শুধু বিশ্ব শান্তির জন্যই হুমকি নয়। তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব তথা অস্তিত্বের জন্য এটা বিরাট হুমকিস্বরূপ।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আফগানিস্তানে সোভিয়েত আক্রমণকে সরাসরি সোভিয়েত আগ্রাসন বলে অভিহিত করে। ইউনাইটেড পিপলস্ পার্টি আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনকে প্রকাশ্য আগ্রাসন বলে উল্লেখ করে।[২৫]

জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি কে এম কায়সার ৬ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতি জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যহীন এবং মৌলনীতির মারাত্মক লংঘন। কে এম কায়সার নিরাপত্তা পরিষদে আফগান পরিস্থিতির উপর বিতর্ককালে বলেন, বাংলাদেশ আফগানিস্তানের মুক্তিকামী জনগণের সার্বভৌমত্ব, অবিচ্ছেদ্য অধিকার, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে তার মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা ও অবাধে নিজ সরকার গঠন নিশ্চিত করার পক্ষপাতী। বাংলাদেশ জাতিসংঘে ৮ জানুয়ারি অপর পাঁচটি দেশের সাথে আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে ও বিনা শর্তে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছে।[২৬]

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিলো সুস্পষ্ট ও সময়পোযোগী। মুসলিম দেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ হিসেবে এ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের অবস্থান ছিলো সুদৃঢ়। বাংলাদেশ আফগান পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যে ৪২ জাতি ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (আইসিও) পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ের এক জরুরী বৈঠকের আহ্বান জানায়।[২৭] পাকিস্তান এ সম্মেলনের স্বাগতিক দেশ। আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্যের অবিলম্বে নিঃশর্ত ও সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের নির্দেশ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ সহ ১৭টি জোটনিরপেক্ষ দেশ ১২ জানুয়ারি, ১৯৮০ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে এক প্রস্তাব রাখে।[২৮]

১৪ জানুয়ারি, ১৯৮০ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানসহ ২২ টি দেশ এ প্রস্তাবের উত্থাপক। এ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়ে ১০৪ টি। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো দেয়ার পর বিষয়টি সাধারণ পরিষদে যায়। সাধারণ পরিষদে ভেটো প্রথা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

১৪ জানুয়ারি, ১৯৮০ গৃহীত এ প্রস্তাবে পুনরায় প্রত্যেক দেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা ব্যক্ত করা হয়। এখানে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের নিন্দা করা হয় এবং সেখান থেকে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে এবং সম্পূর্ণ বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানানো হয়। বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সহ প্রস্তাবক দেশগুলো প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য মহাসচিব কুটওয়াল্ডহেইমকে অনুরোধ জানায়। সাধারণ পরিষদে এ প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলো বাংলাদেশ, বাহরাইন, কলম্বিয়া, মিশর, ফিজি, গাম্বিয়া, হন্ডুরাস, ইন্দোনেশিয়া, নাইজার, মালয়েশিয়া, ওমান, পাকিস্তান, পানামা, পাপুয়া নিউগিনি, ফিলিপাইন, সামোয়া, সৌদি আরব, সেনেগাল, সিঙ্গাপুর, সোমালিয়া, থাইল্যাণ্ড ও তিউনেসিয়া।[২৯]

আফগানিস্তান প্রশ্নে বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের অবদান স্মরণীয়। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আকস্মিক ভাবে রাশিয়ান সৈন্য আফগানিস্তানে প্রেরণ পৃথিবীর সকল দেশকে হতবাক ও বিস্মিত করে। ঘটনার আকস্মিকতায় ও অযৌক্তিকতায় যখন সকলেই ছিলো কিংকর্তব্যবিমূঢ় তখনই মুসলিম বিশ্বের পক্ষ থেকে প্রথম একটি উদ্যোগ আসে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের পক্ষ থেকে। তিনি আফগানিস্তান সংলগ্ন পাকিস্তানে আফগানিস্তান সমস্যা সম্বন্ধে জরুরী ইসলামি সম্মেলন ডাকেন। ইসলামি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র এ উদ্যোগে সাড়া দেয়।[৩০] আর এই উদ্দ্যোগের প্রেক্ষিতেই ২৬ জানুয়ারী, ১৯৮০ পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ইসলামি দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়। ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল হাবিব চাত্তি বলেন, এ সম্মেলন আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের ব্যাপারে একটি অভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করবে।[৩১]

২৯ জানুয়ারি, ১৯৮০ পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বিশেষ সম্মেলনে আফগান জনগণের বিরুদ্ধে সোভিয়েত সামরিক আগ্রাসনের নিন্দা করা হয়। সম্মেলনে আরো বলা হয়, আগ্রাসনের মাধ্যমে জাতিসংঘ সনদের চরম বরখেলাপ করা হয়েছে। ইসলামি পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে গৃহীত ১১ দফা প্রস্তাবে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের মানবাধিকারের বিরুদ্ধে আগ্রাসন এবং জনগণের স্বাধীনতা লংঘন হিসেবে অব্যাহত নিন্দা করার জন্য বিশ্বব্যাপী জনগণ ও সরকার সমূহের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান জানানো হয়। আফগান ভূখণ্ডে অবস্থানরত রুশ সৈন্যদের বিনাশর্তে আশু প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে ইসলামি সম্মেলন সংস্থা বলে, আফগান জনগণের উপর নিপীড়ণমূলক কাজ থেকে রুশ সৈন্যদের বিরত থাকতে হবে।

ইসলামি সম্মেলন সংস্থায় আফগানিস্তানের সদস্যপদ স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। সোভিয়েত সৈন্য পুরোপুরি প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত সম্মেলন তার ভাষায় আফগানিস্তানের অবৈধ সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়ার এবং ঐ দেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। আফগানিস্তানের বর্তমান সরকারকেও সকল সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার জন্য সম্মেলনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সম্মেলনে আফগান জনগণকে সমর্থন দেয়া এবং আগ্রাসনের ফলে স্বদেশ থেকে বিতারিত আফগান শরণার্থীদের সাহায্যদানের জন্য সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।[৩২]

সম্মেলন থেকে ফিরে এসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক সম্মেলনটিকে অত্যন্ত সফল এবং এক ঐতিহাসিক সম্মেলন বলে অভিহিত করেন। আফগান বর্তমান সরকারকে স্বীকৃতি না দেয়ার জন্য সকল সদস্য দেশগুলোকে আহ্বান জানানো হয়। আফগান উদ্বাস্তু প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আফগান উদ্বাস্তুদের সাহায্য দেবার ব্যাপারে সম্মেলনে একটি কমিটি গঠিত হয়। তিনি উদ্বাস্তু পরিস্থিতিকে অত্যন্ত বেদনাদায়ক বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদেরও রয়েছে এবং বাংলাদেশ এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।[৩৩] অধ্যাপক শামসুল হকের এ ধরনের বক্তব্য আমাদের অতীত ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। কারণ তারা আমাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছিলো বিভিন্নভাবে। পাকিস্তানে আটক বাঙালিদের অনেকেই আফগানিস্তান হয়ে পালিয়ে এসেছিলো বাংলাদেশে। আফগানরা সেদিন হাজারো বাঙালিকে খাবার দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলো, বাড়িয়ে দিয়েছিলো বন্ধুত্বের হাত।

১৯৮০ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারের আমন্ত্রণে চার দিনের সরকারি সফরে লণ্ডনে যান। লণ্ডনে প্রেসিডেন্ট জিয়া বিশ্বের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চলে বিরাজমান সংকট নিয়ে আলোচনা করেন, যার অন্যতম ছিলো আফগান সমস্যা।[৩৪] ২৭ আগস্ট, ১৯৮০ প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার ও বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আফগানিস্তান হতে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। হোয়াইট হাউসে দুই প্রেসিডেন্টের মধ্যে বৈঠকের পর প্রকাশিত এক যুক্ত বিবৃতিতে একথা বলা হয়।[৩৫]

জাতিসংঘে বাংলাদেশ পুনরায় বলে যে, কোনোরূপ বিদেশী হস্তক্ষেপ ছাড়া আফগান জনগণকে তাদের ভাগ্য নির্ধারণের সুযোগ দিলেই কেবল ঐ দেশে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আফগানিস্তান সম্পর্কিত বিতর্কে অংশগ্রহণকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সদস্য ড. এ এফ ইউসুফ বলেন, গত ১০ মাসের কাবুলের ঘটনাবলি ঐ এলাকার শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাদের মনে বেদনা, অস্বস্তি ও সন্দেহের জন্ম দেয়ার যথেষ্ট কারণ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, আমরা দেখছি যে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লংঘন করে আফগানিস্তানে বিদেশী হস্তক্ষেপ ঘটেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের মাধ্যমেই কেবল সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতা আসতে পারে। ড. ইউসুফ বলেন, বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বাজায় রাখতে জাতিসংঘকে অবশ্যই দায়িত্ব নিতে হবে এবং এ সংকটের শান্তিপূর্ণ নিষ্পত্তির পথ আমাদের অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে।[৩৬]

৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ থেকে প্রস্তাবিত জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের প্রস্তুতি বৈঠকে আফগানিস্তান সংকটের ব্যাপারে বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোকে একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্য আন্দোলনের প্রতি তাদের নিজ নিজ অঙ্গীকার সমুন্নত রাখার আহ্বান জানায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক শামসুল হক দিল্লিতে বলেন, আফগান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে আফগানিস্তান এবং তার প্রতিবেশী দুই দেশ পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে আলোচনার যে কোনো উদ্যোগকে তাঁর দেশ স্বাগত জানাবে।[৩৭]

জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুটওয়াল্ডহেইম নয়াদিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ ঢাকা আসেন। তিনি আফগানিস্তান সংকট নিরসনের জন্য একজন বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন এবং তিনি হলেন রাজনৈতিক বিষয়ক জাতিসংঘের আণ্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জাভিয়ার পেরেজ ডি কুয়েলার।[৩৮]

Dhaka University Institutional Repository

জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামসুল হক বলেন, জাতিসংঘ সনদ ও জোটনিরপেক্ষতার নীতির প্রতি আমাদের অঙ্গীকার থেকেই আমরা আফগানিস্তান হতে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি। এসব দেশে এমন অনুকূল পরিস্থিতি গড়ে তুলতে হবে যাতে এসব দেশের মানুষ বাইরের কোন রকম হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাদের আপন ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।[৩৯]

জাতিসংঘের মহাসচিব ড. কুটওয়াল্ডহেইম তিন দিনের এক সফরে ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১ (দ্বিতীয়বারের মতো) ঢাকা আসেন। বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রয়াসে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সাথে মহাসচিবের যেসব বিষয়ে আলোচনা হয় তার মধ্যে আফগান প্রসঙ্গ ছিলো অন্যতম।[৪০]

(খ) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : অর্থনৈতিক সম্পর্ক

১৯৭৫ এ স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির পথ ধরেই ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে চুক্তির অধীনে প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। চুক্তিতে আফগান পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা বিভাগের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নবী সালেহী এবং বাংলাদেশ পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বহিঃসম্পদ বিভাগের কারিগরি সহযোগিতা কর্মসূচির প্রধান এম. মহিউদ্দিন।[৪১]

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে পণ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষর করার জন্য আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধি দল ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ ঢাকায় আসেন। আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতা হামিদুল্লাহ টারজি বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতির বাণিজ্য উপদেষ্টা সাইফুর রহমানের সাথে সাক্ষাত করেন এবং বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন। সাইফুর রহমান জানান, বাংলাদেশ আফগানিস্তান থেকে ইতোমধ্যেই পাটজাত পণ্য, চা, কাগজ, দিয়াশলাই, রেয়ন ইত্যাদি আমদানি করেছে। ১৯৭৪-এ স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির পথ ধরে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ একটি খসড়া বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করেন যা চূড়ান্ত করা হয় ১ মার্চ, ১৯৭৭। প্রটোকলে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের বাণিজ্য সচিব এম. মতিউর রহমান

Dhaka University Institutional Repository

এবং আফগান বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের নেতা হামিদুল্লাহ টারজি। প্রটোকলের অধীনে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান প্রত্যেক বছর ২৫ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য বিনিময় করবে বলে স্থির হয়। বাংলাদেশ আফগানিস্তানে রপ্তানি করবে পাটজাত দ্রব্য, রেয়ন, চা, নিউজপ্রিন্ট, কাগজ, মনোহরী সামগ্রী, দিয়াশলাই, চিনি, তাঁতশিল্পজাত সামগ্রী, তার, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, আনারসসহ তাজা ফলমূল, মসলা, হার্ডবোর্ড প্রভৃতি।[৪২] অপরপক্ষে বাংলাদেশ আফগানিস্তান থেকে আমদানি করবে তুলা, তাজা ও শুষ্ক ফলমূল, ঔষধ, পশমী দ্রব্যাদি, মার্বেল, চিপস ও শিল্পজাত পণ্য, শাক-সবজি প্রভৃতি।[৪৩]

সারণি- ১

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি (১৯৭৬-১৯৮১)

অর্থবছর	আমদানি (লাখ)	রপ্তানি (হাজার)
১৯৭৬-৭৭	১৪৭	১০৩০০
১৯৭৭-৭৮	---	২৫২৬৪
১৯৭৮-৭৯	---	১০৫৭০
১৯৭৯-৮০	---	১৬৯৪৪
১৯৮০-৮১	---	২৪৫৬০

উৎস : Annual Import Payment (1987-88), Statistics Department, Bangladesh Bank, p.p. 130- 131.
Annual Export Receipts (1980-81), Statistics Department, Bangladesh Bank, p. 121.

তৃতীয় বিশ্বের যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত অর্থনৈতিক মুক্তি ও রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করা। প্রেসিডেন্ট জিয়া এ বিষয়টি মাথায় রেখেই পররাষ্ট্রনীতির মূল সূত্রগুলো এঁকেছিলেন। সে কারণেই তাঁর প্রদর্শিত পররাষ্ট্রনীতি বিশ্বে বাংলাদেশকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় উপস্থাপন করে। তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম ছিলো মুসলিম দেশ হিসেবে পৃথিবীর অপরাপর মুসলিম দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা। এ বৈশিষ্ট্যের কারণে জিয়াউর রহমান অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশের জন্য এক নতুন দ্বার উন্মোচন করে। এ কারণে ইসলামি বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে উষ্ণ হতে থাকে। আর এ প্রসঙ্গে জিয়াউর রহমান বলেছেন, পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে আমরা জোটনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছি। তবে এক্ষেত্রে আমরা 'ইসলামিক নেচার' অক্ষুণ্ন রেখেই তা করছি। আর এর ধারাবাহিকতায়ই বাংলাদেশ জাতিসংঘ, নিরাপত্তা পরিষদ, ইসলামি সম্মেলন সংস্থা, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপ,

Dhaka University Institutional Repository

ইরান-মার্কিন জিম্মি সংকট বিষয়ে বলিষ্ট ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ এসময় তার পররাষ্ট্রনীতির কারণে বিশ্বের দরবারে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে এক সেনা বিদ্রোহে নিহত হলেও পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে জিয়ার অনুসৃত নীতিই অনুসরণ করা হয়।

তথ্যনির্দেশ

১. Amendments to the Constitution of the People's Republic of Bangladesh, 1972, Proclamation (Amendment) Order No. 1 of 23 April, 1977, Artcle 8 (1A) and Article 12

২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্ব," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অক্টোবর, ১৯৮৪, পৃ. ১৪৬

৩. মুশফিকুল ফজল আনসারী (সম্পা.), *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি: জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়া* (ঢাকা: ন্যাথ পাবলিশার্স, ২০০৪), পৃ. ২১; আরও দ্রষ্টব্য: ইনাম আহম্মদ চৌধুরী, *চিরঞ্জীব জিয়া* (ঢাকা: হাসি প্রকাশনী, ২০০২), পৃ. ১০৬

৪. S. K. Chakrabarti, *The Evolution of Politics in Bangladesh, 1947-78* (New Delhi: Associated Publishing House, 1978), p. 239

৫. *The Bangladesh Times,* 7 May, 1976; আরও দ্রষ্টব্য: *The Bangladesh Observer,* 7 May, 1976

৬. *দৈনিক আজাদ*, ১ জুলাই, ১৯৭৬

৭. *The Bangladesh Times,* 17 July, 1976; আরও দ্রষ্টব্য: *The Bangladesh Observer,* 17 July, 1976

৮. *The Bangladesh Times,* 3 March, 1976

৯. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জুলাই, ১৯৭৬

১০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

১১. *The Bangladesh Observer,* 8 March,1977; *The Bangladesh Times,* 8 March, 1977

১২. *দৈনিক বাংলা*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

১৩. *দৈনিক আজাদ*, ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮। আরও দ্রষ্টব্য: *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

১৪. *The Bangladesh Times,* 29 March, 1979

১৫. *দৈনিক সংবাদ*, ১ জানুয়ারি, ১৯৮০

১৬. Golam Mostofa, *National Interest and Foreign Policy: Bangladesh Relations with Soviet Union and Its Successor States* (Dhaka: The University Press Limited, 1995), p. 114

Dhaka University Institutional Repository

১৭. *Ten Years of Bangladesh in the United Nations, Speeches of Heads of State, Heads of Government and Foreign Ministers of Bangladesh at the UN General Assemby, 1974-84* (Dhaka: Bangladesh: Ministry of Foreign Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, 1984), p. 83

১৮. *দৈনিক বাংলা*, ২ জানুয়ারি, ১৯৮০

১৯. *দৈনিক সংবাদ*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৮০

২০. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৮ জানুয়ারি, ১৯৮০

২১. *দৈনিক আজাদ*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৮০

২২. *দৈনিক সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি, ১৯৮০

২৩. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৮০

২৪. *দৈনিক সংবাদ*, ৪ জানুয়ারি, ১৯৮০

২৫. *ঐ*, ৭ জানুয়ারি, ১৯৮০

২৬. *ঢাকা ডাইজেস্ট: বিশেষ সংবাদ সংখ্যা*, ৮ম বর্ষ; ৭ম সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮০

২৭. আল মাহমুদ ও আফজাল চৌধুরী (সম্পা.), *আফগানিস্তান আমার ভালবাসা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩), পৃ. ১৭৪

২৮. *দৈনিক সংবাদ*, ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮০

২৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৬ জানুয়ারি, ১৯৮০

৩০. মুশফিকুল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

৩১. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৮০

৩২. ঐ, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮০

৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮০

৩৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৬ জুন, ১৯৮০

৩৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৯ আগস্ট, ১৯৮০

৩৬. *দৈনিক বাংলা*, ২১ নভেম্বর, ১৯৮০

৩৭. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

৩৮. *দৈনিক সংবাদ*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

৪০. *ঐ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

৪১. *ঐ*, ১৬ জুলাই, ১৯৭৬

৪২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

৪৩. *Annual Import Payment*, 1976-77, 1977-78, Statistics Department, Bangladesh Bank, p.p. 34, 44

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশ–আফগানিস্তান সম্পর্ক : এরশাদ আমল (১৯৮২-১৯৯০)

(ক) বাংলাদেশ-আফগানিস্তান : রাজনৈতিক সম্পর্ক

জেনারেল জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর অন্তবর্তীকালীন সরকার পরিচালিত হয় উপ-রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নেতৃত্বে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে ও সাংবিধানিক প্রয়োজনে ১৯৮১ তে অনুষ্ঠিত হয় জরুরী সাধারণ নির্বাচন। অনেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামি প্রবণতার নির্দেশক হিসেবে নির্বাচনের ফলাফলকে বিচার করতে চেয়েছেন। নির্বাচনে অন্যতম প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ছিলেন রাজনীতির অঙ্গনে এক নতুন আগন্তুক হাফেজ্জী হুজুর। তিনি নির্বাচনে তৃতীয় স্থান অধিকার করে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেন। অনেকে মনে করেছিলেন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাহীন হাফেজ্জী হুজুরের তৃতীয় স্থান অধিকার ক্রমপ্রসারমান ইসলামি প্রবণতার প্রমাণ।[১] যদিও ভোটের হিসেবে তিনি পান মোট প্রদত্ত ভোটের মাত্র ১.৭৯%।

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ বাংলাদেশের তৎকালীন সেনাপ্রধান হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। এরশাদের ক্ষমতা দখল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রনীতিতে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটায়। ২৪ মার্চের বক্তৃতায় এরশাদ ঘোষণা করেন, সবার প্রতি বন্ধুত্ব কারো প্রতি শত্রুতা নয় জিয়াউর রহমানের এ আদর্শই হবে পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি; তবে ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে ঘনিষ্টতর সম্পর্কের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।[২] এরপর দু'টো বক্তৃতায় এরশাদ জানিয়ে দেন যে, ইসলামই হবে রাষ্ট্রীয়নীতির মূল ভিত্তি। সচিবালয় কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের সংবিধানে ইসলামকে তার ন্যায্য স্থানটি দিতে হবে। ১৯৮৩ এর ১৪ জানুয়ারি বক্তৃতায় তিনি আরো জোরালোভাবে বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্ম হিসেবে আমাদের ভবিষ্যত সংবিধানে ইসলামকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হবে।[৩] এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে তিনি রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে সংবিধানে সন্নিবেশিত করে রাষ্ট্রনীতিমালায় একটি পরিবর্তন ঘটান।[৪] অপরদিকে পররাষ্ট্র নীতির আদর্শিক ভিত্তি

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গে এরশাদ সরকারের বক্তব্য হলো, "ইসলামি সম্মেলন সংস্থা, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও জাতিসংঘ সনদের লক্ষ্য ও মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে আমাদের পররাষ্ট্রনীতি রচিত"।[৫] কাজেই তিনটি মূলনীতির অন্যতম হলো ইসলামি সংহতি। সুক্ষ্ম বিচারে এটা প্রতীয়মান হয় যে, এরশাদ সরকারের রাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রনীতিতে সমান্তরালভাবে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের প্রয়াস ছিলো।

ক্ষমতাসীন হবার পর থেকেই পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এরশাদ সরকারের লক্ষ্য ইসলামি বিশ্বের সঙ্গে যত বেশী সম্ভব ঘনিষ্টতর সম্পর্ক গড়ে তোলা। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, মূলনীতির বিচারে এরশাদ তাঁর পূর্বসূরীর পথ থেকে বিচ্যুত হননি; এরশাদের পররাষ্ট্রনীতি মোটা দাগে জিয়া অনুসৃত নীতিরই প্রতিফলন বলা যায়। মনে করা হয় যে, এরশাদের পররাষ্ট্রনীতির কাঠামো বা সমীকরণ আগে থেকেই তৈরি হয়েছিলো। এক্ষেত্রে বলা যায় যে, জিয়া মুজিব আমলে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জিয়ার সময়ে পররাষ্ট্রনীতির যে নীতি লক্ষ্য অনুসৃত হয়, তাই এরশাদ আমলে স্থায়ী পররাষ্ট্রনীতিতে রূপ নেয়।

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে এরশাদ সরকারের সম্পর্ক জিয়া সরকারের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়। বিশেষ কোনো জটিলতা এ সময়ের সম্পর্কের ভেতর দেখা যায়নি। তবে তাঁর সময়কালে মুসলিম বিশ্বের দু'তিনটি সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হয়। এর ভেতর ছিলো ইরাক-ইরান যুদ্ধ, ফিলিস্তিন সমস্যা এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব যা আমাদের আলোচ্য অভিসন্দর্ভের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

এখানে উল্লেখ্য, জিয়া আমলেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর উপস্থিতি প্রশ্নে বাংলাদেশ নীতি নির্ধারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিলো মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের অন্যতম সহায়তাকারী রাষ্ট্র। আফগানিস্তান প্রশ্নে তাই প্রথমদিকে বাংলাদেশ কিছুটা নীরব ভূমিকা পালন করে। কিন্তু মুসলিম দেশ বাংলাদেশ আরব বিশ্বের সাথে আফগানিস্তানে রাশিয়ান আগ্রাসন প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে সহমর্মিতা প্রকাশ করাতে বাংলাদেশ অনেকটা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরাগভাজন হয়। ১৯৭৯ সালে মূলত বাংলাদেশের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগেই আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিষয়টি বিবেচনার জন্য ইসলামাবাদে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার একটি জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[৬]

আফগানিস্তান নীতিটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এরশাদ আমলে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান ছিলো সোভিয়েত বিরোধী।[৭] আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্বে বাংলাদেশ জোরালো প্রতিবাদ জানায়। শুধু প্রতিবাদই জানায়নি; বিভিন্ন ফোরামে এর বিরুদ্ধে ছিলো সোচ্চার। বহু বাংলাদেশী গোপনে আফগান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো।[৮]

আফগানিস্তানে সোভিয়েত জবর দখল আকস্মিক নয়। আঞ্চলিক আধিপত্য বিস্তারের জন্য একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ মাত্র। রণনৈতিকভাবে এক সুবিধাজনক অবস্থানে আফগানিস্তান অবস্থিত। মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর এবং দক্ষিণ এশিয়ার সংযোগস্থলে আফগানিস্তান এতদঞ্চলে রুশপ্রভাব বলয় বিস্তারের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আফগানিস্তান, মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য উপসাগরীয় দেশ, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশসমূহে তেল সরবরাহ করে। দক্ষিণ এশিয়া ভারত মহাসাগর, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

সত্তর দশকের শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগরে তার প্রভাব বিস্তার করে। আফগানিস্তানে রুশ অবস্থান পূর্বদিকে ইরানের উপর খবরদারী, পারস্য উপসাগর নিয়ন্ত্রণ, লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরে তার সামরিক শক্তি মহড়া পরিচালনার জন্য এক সুবিধাজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বদিকে পাকিস্তানের ওপর প্রভাব বলয় বিস্তারে সফল হলে প্রশান্ত মহাসাগরে মালাক্কা প্রণালীতে অবস্থিত নৌবহরের সাথে তার সংযোগ রক্ষার পথ প্রশস্ত হতে পারে। পাকিস্তান ও ইরান সীমান্তে রুশ সামরিক উপস্থিতি জোরদার করা হয় ১৯৮০ সাল থেকেই। পাকিস্তান ও ইরানের অভ্যন্তরে রুশপন্থী শক্তিসমূহকে সংগঠিত করা হয় এ দৃষ্টিভঙ্গি সামনে রেখে। অর্থাৎ আফগানিস্তানে রুশ পরিস্থিতি এবং তার তৎপরতা প্রতিবেশী দেশসমূহ ও বিশ্ববাসীর জন্য এক মহা বিপদজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। শত শত বছর ধরে আক্রমণকারীরা উপমহাদেশের সবুজ চত্বরে যে পথ ধরে এগিয়ে এসেছে, সেই পথ চলে আসে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে। এই সামরিক উপস্থিতি আফগানিস্তানসহ উপমহাদেশের সকল দেশের শান্তি আর স্বাধীনতাকে হুমকির সন্মুখীন করে তুলেছে।[৯]

বাংলাদেশ একটি জোটনিরপেক্ষ এবং ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ। অপরপক্ষে আফগানিস্তানও একটি জোটনিরপেক্ষ এবং ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ। উভয় দেশেরই রয়েছে হাজার বছরের ঐতিহাসিক যোগাযোগ এবং অভিন্ন ধর্মীয় মতাদর্শ। প্রতিবেশী মুসলিম দেশ হিসেবে দু'টি রাষ্ট্রই একে অপরের বিপদে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, বাড়িয়ে দিয়েছে সাহায্যের হাত। তাই আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনে বাংলাদেশ নীরব ভূমিকা পালন না করে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারে সব সময় ছিলো সোচ্চার; সে প্রমাণ দিয়েছে তার বক্তব্য ও কর্মে।

দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় আফগান সমস্যা

শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামলের শেষ দিক হতেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, আর সেটি হলো রুশ প্রভাবলয় থেকে বেরিয়ে আসা ও ক্রমান্বয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়া। পরবর্তীতে জিয়া সরকার শেখ মুজিবর রহমানের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয় এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক জোরদার করে। জিয়া সরকারের শেষ দিকে ১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন শুরু হয়। জিয়া সরকার তার পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনেই রাশিয়ার বিরোধিতা ও আফগানিস্তানকে সমর্থন করে। এরশাদ সরকার পররাষ্ট্রনীতিতে সম্পূর্ণ জিয়া সরকারকে অনুসরণ করে এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে অধিকতর ইসলামিকরণ করেন। এরশাদ সরকারের সময়ে মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক আরো জোরদার হয়। হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ তাঁর শাসনামলে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাথে বিভিন্ন সময় দ্বিপাক্ষিক আলোচানায় মিলিত হন। এ সময় তিনি যে দেশেই গিয়েছেন সেখানেই আফগানিস্তান থেকে বিদেশী শক্তিকে উৎখাত ও আফগান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের বিষয়ে জোরালো মত প্রকাশ করেছেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্র প্রধান হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ ২ মে, ১৯৮২ এক রাষ্ট্রীয় সফরে সৌদি আরবে পৌছেন এবং সেখানে অবস্থানকালে সৌদি বাদশা খালিদ বিন আব্দুল আজিজের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন যার অন্যতম ছিলো আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন। দুই রাষ্ট্রপ্রধান ইসলামি সংহতির ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়ার এবং নিজেদের জাতীয় স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা সংক্রান্ত সকল ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা ও একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর জন্য দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন। তাঁরা সার্বভৌম ক্ষমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার এবং সকল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা জাতিসংঘ সনদ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রতি এবং আদর্শের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। দুই রাষ্ট্রপ্রধান উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আফগান ভূমি থেকে সকল সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার এবং বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সে দেশের জনগণ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দাবি জানান। সফর শেষে হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ বলেন, বাংলাদেশ আফগানিস্তান থেকে সব বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে। আফগানিস্তানের জনগণকে তাদের নিজস্ব রীতির সরকার গঠন করতে দেয়া দরকার বলে তিনি উল্লেখ করেন।[১০]

যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্টের সদস্য রাদায়ান বলাইকোভিচ ১৬ আগস্ট, ১৯৮২ বাংলাদেশে আসেন ৭ম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলন প্রসঙ্গে আলোচনার জন্য। আলোচনা শেষে যুক্ত ইশতেহারে তিনি বলেন, জগৎ জুড়ে আজ উত্তেজনা ও যুদ্ধের আগুন জ্বলছে, পরাশক্তির অস্ত্র ও প্রভাববলয় প্রসারের প্রতিযোগিতাও বাড়ছে এবং তৃতীয় বিশ্ব বিশেষ করে ছোট ছোট দেশ নানা রকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তিনি বলেন, সকল প্রকার আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ও মানবতার আদর্শ লংঘন করে আফগানিস্তান থেকে বৈধ সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে এবং বিদেশী সৈন্য এ দেশটিতে জবরদখল করে রয়েছে।[১১]

বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ.এম এরশাদ ৪টি দেশ সফর করে ৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা ফেরেন। তিনি কুয়েত, মরক্কো, ফ্রান্স ও জর্ডান সফর করেন। এ দেশ সফরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আলোচনার মধ্যে আফগান ইস্যুটি স্থান পায়।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

জর্ডান সফরকালে জেনারেল এরশাদ বাদশাহ হোসেনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। তাঁরা ইসলামি বিশ্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। যার মধ্যে অন্যতম ছিলো আফগান সমস্যা।[১৩] মরক্কো সফরকালে জেনারেল এরশাদ ও মরক্কোর প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনাকালে আন্তর্জাতিক শান্তি জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। তাঁরা ইসলামি দেশগুলোর মধ্যে সংহতি ও সহযোগিতার গুরুত্বের উপর জোর দেন। উভয়দেশ আফগান পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সে দেশ হতে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের ভিত্তিতে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দেয়।[১৪]

আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখল সম্পর্কে বাংলাদেশের নীতি সুস্পষ্ট। বাংলাদেশের দাবি আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে এবং সে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার আফগানদের উপর ন্যস্ত করতে হবে। তৃতীয় বিশ্ব ও জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নীতিগতভাবেই এ আগ্রাসনের বিরোধিতা করে। পাকিস্তানের একটি আফগান উদ্বাস্তু শিবির পরিদর্শনকালে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ.আর শামস-উদ-দোহা আমাদের দেশের এ নীতি পুনরায় ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, মুসলিম দেশ বাংলাদেশ সবসময় আফগানদের সমর্থন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে। পেশোয়ার জেলায় নাসিরাবাদ আফগান শিবিরে আফগানরা বলেন, যতদিন পর্যন্ত না তাঁরা তাঁদের দেশে ফিরে যাবে ততদিনই তাঁরা তাঁদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে আফগান স্বার্থের প্রতি যে সমর্থন দিয়েছে শরণার্থীরা তার প্রশংসা করে বাংলাদেশের এ ভূমিকার জন্য জেনারেল এরশাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং বলেন, বাংলাদেশ সব সময়ই আফগানদের সমর্থন করে আসছে এবং ভবিষ্যতেও করে যাবে।[১৫]

৮ আগস্ট, ১৯৮৩ তিন দিনব্যাপী সরকারি সফরে ঢাকায় আসেন থাইল্যাণ্ডের প্রধাননন্ত্রী জেনারেল প্রেম তিনসুলানন্দ। এ উপলক্ষ্যে জেনারেল এরশাদ তাঁর ভাষণে সমগ্র বিশ্ব এবং বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় অঞ্চল সমূহের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী অবনতিশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার নীতি লংঘনের ঘোরতর বিরোধী। জেনারেল প্রেম তিনসুলানন্দ বলেন, বাংলাদেশ এবং থাইল্যাণ্ড দু'দেশেই শান্তি অক্ষুণ্ন রাখা

Dhaka University Institutional Repository

এবং আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় বিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গে উভয় দেশের সরকার প্রধানই আফগান সমস্যার আশু সমাধানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।[১৬] থাই প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ভূলুণ্ঠিত করেছে। এ দু'টি দেশেই এখন চলছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার লড়াই এবং পরিণামে আঞ্চলিক শান্তি চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশ ও থাইল্যাণ্ড জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে বিভিন্ন দেশের মাধ্যমে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলা উচিত তাঁদের বক্তব্য থেকে বস্তুত এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[১৭]

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ এক রাষ্ট্রীয় সফরে ইরাকে যান। ৭ জানুয়ারি, ১৯৮৮ প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও ইরাকি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে আলোচনায় বসেন। তাঁরা প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিষয় বিশেষ করে ইসলামি উম্মাহ সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে ফলপ্রসূ মত বিনিময় করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ও প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন ইসলামি বিশ্বের বৃহত্তম ঐক্য ও সংহতির জন্য একত্রে কাজ করে যাবে বলে তাঁদের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তাঁরা আফগান সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনায় মত বিনিময় করেন।[১৮] প্রেসিডেন্ট এরশাদ ৪ জানুয়ারি মিশর সফরে যান। বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মিশর ও বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন মনোভাব রয়েছে। মিশর জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। জোটনিরপেক্ষতা নীতির প্রতি উভয় দেশেরই রয়েছে অবিচল আস্থা। অন্যদিকে বাংলাদেশ ও মিশর উভয়ই ইসলামি রাষ্ট্র সংস্থার সদস্য হিসেবে ইসলামি বিশ্বের ঐক্য জোরদার এবং মধ্যপ্রাচ্য, আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য একাত্মতা ঘোষণা করে।[১৯]

আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপ : জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশ জাতিসংঘের অন্যতম সদস্য রাষ্ট্র। ১৯৭৪ সালের ১৭ অক্টোবর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন হবার পর নতুন এ রাষ্ট্রটির জন্য যেসব বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় তা হলো স্বীকৃতি অর্জন, বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

আন্তর্জাতিক সংস্থায় সদস্যপদ লাভ প্রভৃতি। কিন্তু এ সময়ে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থায় সদস্যপদ লাভের পেছনে কিছু রাষ্ট্র প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে। যেমন- বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে চীনের বিরোধিতা, পাকিস্তানসহ ওআইসিভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্রের বিরোধিতা, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমধর্মী একটি রাষ্ট্র হলো আফগানিস্তান। ওআইসিভুক্ত মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও আফগানিস্তান জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি পশ্নে বাংলাদেশের পক্ষে তার সমর্থন ব্যক্ত করে। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ এই বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র আফগানিস্তানের কথা কখনোই ভুলে যায়নি। ১৯৭৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর সকল আন্তর্জাতিক রীতিনীতি লংঘন করে রাশিয়া আফগানিস্তানে হামলা চালায়। বাংলাদেশ এ সময় আফগানিস্তানের স্বার্থ রক্ষায় ছিলো সদা সচেষ্ট। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করেছে এবং আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার ও নিজেদের পছন্দমতো সরকার গঠনের পক্ষে তার বলিষ্ঠ অভিমত প্রকাশ করেছে।

জাতিসংঘের যে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধী বাংলাদেশ। বাংলাদেশ দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করে যে, বিশ্বের প্রতিটি দেশের অভ্যন্তরীণ যে কোনো সমস্যা অনিবার্যভাবে সেই দেশের নিজস্ব ব্যাপার। ১৯৮২ তে নিরাপত্তা পরিষদে সিচেলিস সংক্রান্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় যাতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হিসেবে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, সে সিচেলিসে বহিরাগত আগ্রাসনের বিরোধী। আর একই কারণে বাংলাদেশ আফগানিস্তানে বিদেশী হামলার তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে।[২০]

৮ অক্টোবর, ১৯৮২ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি খাজা ওয়াসিউদ্দিন সাধারণ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি বলেন, আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়া সমস্যা এখন পর্যন্ত অমীমাংসিত থাকার ঘটনা হতাশাব্যাঞ্জক। তিনি বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনগণকে আপন ভাগ্য নির্ধারণ করতে দেয়ার জন্য এসব দেশ থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।[২১] বাংলাদেশ প্রতিনিধি মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) কে.এম. শফিউল্লাহ্ ২ নভেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে

Dhaka University Institutional Repository

যোগ দেন। তিনি বলেন, জাতিসংঘ সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের নীতিমালা অনুসারে আফগান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করার জন্য সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে বাংলাদেশ আহ্বান জানিয়েছে। তিনি বলেন বিশ্ব সমাজের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয়নি এবং এখনো আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে তা হুমকি হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরাম প্রদত্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন বিবৃতির কথা উল্লেখ করে তিনি পুনরায় এই বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করে বলেন, কোনো বহিঃশক্তি কিংবা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ মুক্ত হয়ে পছন্দসই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমাজব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি নির্ধারণ করা হচ্ছে সমস্ত জনগণের অলংঘনীয় অধিকার।[২২]

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২৯ নভেম্বর, ১৯৮২ আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সামরিক অভিযানের পর সাধারণ পরিষদ এ নিয়ে চারবার এ ধরনের আহ্বান জানান। তৃতীয় বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশের মিলিত উদ্যোগে উত্থাপিত এ প্রস্তাব ১৪৪-২১ ভোটে গৃহীত হয়; যার মধ্যে অন্যতম দেশ ছিলো বাংলাদেশ। প্রস্তাবে পুনরায় গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা হয় যে, আফগানিস্তান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সে দেশের সার্বভৌমত্ব আঞ্চলিক সংহতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জোটনিরপেক্ষতার চরিত্র সংরক্ষণ একান্ত অপরিহার্য। প্রস্তাবে বাইরের প্রভাবমুক্ত থেকে আফগান জনগণের নিজেদের পছন্দমতো সরকার বেছে নেয়ার অধিকারের প্রতি পুনঃস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) খাজা ওয়াসিউদ্দীন ২৩ নভেম্বর, ১৯৮৩ নিউইয়র্কে সাধারণ পরিষদে আফগানিস্তান পরিস্থিতি ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ আফগানিস্তানের জনগণকে বিদেশী সৈন্যের উপস্থিতি কিংবা হুমকি ছাড়াই নিজেদের সরকার গঠন করার সুযোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, এ প্রশ্নে বাংলাদেশের সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নীতির ভিত্তি হচ্ছে সকল রাষ্ট্রেরই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ কিংবা প্রয়োগের হুমকি

Dhaka University Institutional Repository

হতে বিরত থাকার বাধ্যবাধকতার নীতিমালা। এছাড়া বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সকল রাষ্ট্রের জনগণের অবাধ বাছাইয়ের মাধ্যমে নিজস্ব সরকার গঠন এবং নিজস্ব অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি পছন্দ করার নীতিতেও বাংলাদেশ বিশ্বাসী। তিনি আরো বলেন যে, বিদেশী বাহিনীর বিরুদ্ধে আফগানরা এতো বীরত্বের সাথে লড়াই করছে, রুশদের প্রত্যাহার করা না হলে এবং জনগণের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থাভাজন সরকার বাছাই করার নিশ্চয়তা না পেলে আফগান শরণার্থীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে রাজি করানো অচিন্তনীয় ব্যাপার। আফগানিস্তানের সমস্যা শুধু সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমেই সমাধান করা সম্ভব।[২৩]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ৪ সেপ্টেম্বর নয় সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দল নিয়ে নিউইয়র্কে যান। ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৩৯তম অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে বাংলাদেশ আফগানিস্তান হতে সকল সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কে জোরালো ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে মূল্যবান কূটনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করেছে তা আমাদের স্মৃতির গভীরে রক্ষিত আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তারা যা কিছু করবে তা আমরা সমর্থন করে যাবো। আমরা নীতিগতভাবে মনে করি যে, আফগানিস্তান হতে তাদের সকল সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত। কারণ আফগানিস্তান সমস্যার যে কোনো ন্যায়সঙ্গত ও সন্তোষজনক সমাধানের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হচ্ছে আফগানিস্তান হতে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার। আফগান জনগণের অবিচ্ছেদ্য ন্যায়সঙ্গত অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হলে বাইরের সামরিক বা অন্য কোনো ধরনের হস্তক্ষেপমুক্ত ও স্বাধীনভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদ্ধতি গড়ে তোলার সুযোগ দিতে হবে।[৩৮] হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী অধিবেশনে আরো বলেন, জাতিসংঘ সনদ ও নীতিমালা, সর্বজাতির সার্বভৌম সমতা, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা, সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ থেকে বিরত থাকা, প্রতিটি রাষ্ট্রের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, সকল বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার নীতির প্রতি আমরা দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। আর এ কারণেই আফগানিস্তান ঘটনাপ্রবাহে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ পুনরায় দৃঢ়তার সাথে আফগানিস্তান সমস্যার একটি সর্বাঙ্গীন রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছে। জাতিসংঘ সনদের আদর্শ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে প্রকৃত আলাপ-আলোচনা ও পারস্পারিক সমঝোতা প্রক্রিয়ায় এ সমাধান হতে হবে। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি খাজা ওয়াসিউদ্দিন ১৫ নভেম্বর, ১৯৮৪ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আফগানিস্তান পরিস্থিতি, বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তাৎপর্যের উপর অনুষ্ঠিত বিতর্কে এ বক্তব্য রাখেন। তিনি আফগানিস্তান প্রশ্নের সর্বাঙ্গীন সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষের বৃহত্তর রাজনৈতিক সংকল্পের পরিচয় দানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ বরাবর এ দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করে এসেছে যে, আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার স্থায়ী ও ন্যায়সঙ্গতভাবে আফগান সমস্যা সমাধানের এক অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বাংলাদেশ দৃঢ়ভাবে বলে এসেছে আফগান জনগণকে বাইরের কোনো রকম বাঁধা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব কায়দায় রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বেছে নেয়ার অলংঘনীয় অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।[২৫]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বিশ্বশান্তি উন্মোচনে একযোগে কাজ করতে পুনরায় আত্মনিয়োগের জন্য বিশ্বের জাতিসমূহের প্রতি আহ্বান জানায়। তিনি বলেন শান্তির এ বিশ্ব হবে এমন এক স্থান যেখানে যুদ্ধের কোনো চিহ্ন থাকবেনা, যেখানে ন্যায় ও মানবিক মর্যাদা থাকবে চিরসমুন্নত। তিনি আলোচনায় আফগানিস্তানে বহি:শত্রুর আক্রমণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।[২৬]

৬ অক্টোবর, ১৯৮৭ জাতিসংঘে জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ভাষণ দেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আফগানিস্তান পরিস্থিতির উল্লেখ করেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নীতিমালার ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান।[২৭] জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি বিচারপতি বি.এ সিদ্দিকী ১১ নভেম্বর, ১৯৮৭ সাধারণ পরিষদে এক বিবৃতিতে বলেন, তাঁর দেশ আফগানিস্তানকে একটি সার্বভৌম স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে দেখতে চায়, তিনি আফগানিস্তান পরিস্থিতি এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপর এর প্রভাব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ যথাসম্ভব কম সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার এবং আফগান জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেবার দাবি জানিয়েছে।[২৮] জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান সম্বলিত একটি প্রস্তাব ৪৮টি দেশের পক্ষ থেকে পাকিস্তান উত্থাপন করে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করে।[২৯]

আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, আফগানিস্তান ও পাকিস্তান একাধিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। তবে, মুসলিম বিদ্রোহীরা লড়াই চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। জেনেভায় প্রাক্তন লীগ অফ নেশনস্ সদর দফতরের পরিষদ কক্ষে এক অনুষ্ঠানে এসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী এডওয়ার্ড সেভার্দনাদজে, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজ, আফগান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল ওয়াকিল এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জইন নূরানী এগুলোতে স্বাক্ষর করেন। ঐ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘ মহাসচিব জাভিয়ের পেরেজ দ্যা কুয়েলার। ৩৬ পৃষ্ঠার দলিলে সন্নিবেশিত একাধিক চুক্তিতে চারটি দেশ জানায় আফগানিস্তান থেকে পর্যায়ক্রমে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে। প্রত্যাহার কাজ শুরু হবার কথা ছিলো ১৫ মে এবং এর পরবর্তী নয় মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে। আফগানিস্তানে আনুমানিক এক লাখ ১৫ হাজার সোভিয়েত সৈন্য ছিলো। এতে বলা হয় ১৫ মে থেকে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনো হস্তক্ষেপ হবেনা এবং আনুমানিক ৫০ লাখ আফগান উদ্বাস্তুর স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তন শুরু হবে। প্রধানত পাকিস্তান ও ইরানে এসব উদ্বাস্তু রয়েছে।

আর একটি দলিলে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার এবং সশস্ত্র হামলা, অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বা তাদের ভূখণ্ডে ভাড়াটে সৈন্য প্রশিক্ষণ বা নিয়োগ থেকে বিরত থাকার নীতি কঠোরভাবে মেনে চলতে সম্মত হয়। দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্তচরদের বরদাশত করবে না বলে সম্মত হয়।

পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের রাজনৈতিক নিষ্পত্তির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে সোভিয়েত ও মার্কিন প্রতিনিধিরা একটি দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেন। তাঁরা এ দু'টি দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। চুক্তির সংযোজনীতে জাতিসংঘ কর্তৃক এ এলাকায় একজন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এ কর্মকর্তা হবেন দুইটি পৃথক ইউনিয়নের প্রধান। এর একটি ইউনিট থাকবে কাবুলে অপরটি ইসলামাবাদে। এসব ইউনিট দু'দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির বাস্তবায়ন কাজ তদারক করবে। জাতিসংঘ মহাসচিব এ চুক্তিকে সবচেয়ে বড় সাফল্য বলে বর্ণনা করেন।[৩০] সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র চুক্তির নিশ্চয়তাকারী হওয়ায় মহাসচিব দেশ দু'টিকে ধন্যবাদ জানান। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেভার্দনাদজে বলেন, তার দেশ পরাজয় বোধ করছেনা। সোভিয়েত সৈন্যরা এ মনোভাব নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছে যে, তাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ শুলজ বলেন, জেনেভায় যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে তা মেনে চলতে হবে এবং আফগান জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আফগান প্রেসিডেন্ট নজীবুল্লাহ কাবুল রেডিওতে এক ভাষণে সাতদলীয় প্রতিরোধ জোট নেতাদের যুদ্ধাবসানের আহ্বান জানান। ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক বলেন যে, গেরিলারা নজীবুল্লাহ সরকারের পতন ঘটাবে এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। তিনি চুক্তি স্বাক্ষরের দিনটিকে ঐতিহাসিক বলে বর্ণনা করেন। আফগান সংকট প্রশ্নে জেনেভায় শান্তির দলিল স্বাক্ষরকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশ আশা প্রকাশ করে যে, এসব দলিল অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করা হবে।

শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরে বাংলাদেশ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বাসসকে বলেন, বাংলাদেশ সব সময়ই জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ ও ইসলামি সম্মেলনের প্রস্তাব সমূহের ভিত্তিতে এ সমস্যার একটি আপোষ-নিষ্পত্তির পক্ষে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এসব দলিল বাস্তবায়নের ফলে আফগানিস্তানে একটি অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে, যাতে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু শান্তি ও মর্যাদার সঙ্গে নিজেদের আবাস ভূমিতে ফিরতে পারে। চৌধুরী বলেন, একনিষ্ঠ ও ধৈর্যশীল প্রয়াসের মধ্য দিয়ে জটিল ও দূরূহ পরিস্থিতি নিরসনে জাতিসংঘ যে কত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে এ চুক্তি স্বাক্ষর তা আরেকবার প্রমাণ করলো। তিনি আরও আশা প্রকাশ করেন, আফগানিস্তানের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণ এমন শান্তি ও স্থিতিশীলতা ভোগ করবে এবং তারা তার ন্যায়সঙ্গত দাবিদার।[৩১]

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ আফগান চুক্তির প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা দেখাবার জন্য সব পক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। শান্তিচুক্তি যাতে বানচাল না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সব পক্ষেরই দায়িত্ব।

Dhaka University Institutional Repository

আফগান মুজাহিদ, আফগান সরকার এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন সব পক্ষেরই এখন বিবেচনার সঙ্গে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।[৩২]

আফগানিস্তানে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের সূচনা থেকেই বাংলাদেশ বলে আসছে আফগান বিরোধ মীমাংসার দায়িত্ব সে দেশের জনগণের উপরই ছেড়ে দেয়া উচিত। সামরিক শক্তির দাপটে স্বাধীনতাপ্রিয় আফগানদের দমন করা যাবেনা। দমননীতি ও সামরিক তৎপরতা যত বাড়বে তত তীব্র ও সম্প্রসারিত হবে প্রতিরোধ লড়াই। গত আট বছরে এ সত্যটি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে হয়েছে। রাশিয়ার বিপুল অর্থ ও লোকক্ষয় হয়েছে আফগান যুদ্ধে। তাঁরা তাবেদার সরকারকে নিরাপদ করতে পারেনি।

এ বাস্তবতা এবং কিছুটা গরবাচেভের নতুন নীতির প্রভাবে মস্কো শেষ পর্যন্ত শান্তির পথে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে তার সকল সৈন্য প্রত্যাহার এবং মোজাহেদিন দলগুলোর সঙ্গে সরাসরি আলোচনার উদ্যোগ নেয়া হয়। এ শান্তি প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা অবশ্য দেখা দিয়েছিলো মাঝখানে। মস্কো ঘোষণা করেছিলো সৈন্য প্রত্যাহার স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত। আফগানিস্তানের বিভিন্ন সামরিক তৎপরতাও বেশ বেড়েছিলো। সামরিক সরবরাহ বর্ধিত হারে আসা শুরু হয়েছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুক্তিরই জয় হবে বলে দেখা যাচ্ছে।

আফগানিস্তানে রুশ হস্তক্ষেপ : ওআইসিসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভূমিকা

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান উভয়ই ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ। উভয়ই জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী। আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন বিষয়টি বাংলাদেশসহ সকল ওআইসিভুক্ত ও জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসারী দেশগুলোর কাছে ছিলো চরম অবমাননাকর। তাই আফগানিস্তান থেকে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষ ও ওআইসিভুক্ত দেশসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্মেলনের আয়োজন করেছে আর তাতে বাংলাদেশ আফগানদের পক্ষে তার বলিষ্ঠ মতামত ব্যক্ত করেছে।

৩১ মে - ৪ জুলাই, ১৯৮২ কাতারের রাজধানী দোহাতে জোটনিরপেক্ষ সংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শামস-উদ-দোহা অংশগ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দোহা সম্মেলনে আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার সুনিশ্চিত করার আহ্বান জানান।[৩৩]

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান দু'টি বন্ধুপ্রতীম মুসলিম দেশ। উভয় দেশই জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। ওআইসিভুক্ত মুসলিম দেশ হওয়াতে ধর্মীয় অনুভূতি ও চিন্তাচেতনায়ও রয়েছে সাদৃশ্য। আর দু'টি দেশই দক্ষিণ এশিয়াতেই অবস্থিত বলে ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেও তাদের জীবনবোধে রয়েছে একই ধরনের বোধ। এজন্য বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনায় আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ সব সময়ই একই কাতারে দাঁড়িয়ে একই ধরনের বক্তব্য প্রকাশ করেছে। আর এ কারণে সাইপ্রাসের নিকোশিয়ায় জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মন্ত্রী পর্যায়ে যে বৈঠক হয় তাতে লেবানন প্রশ্নে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের অবস্থান ছিলো একই কাতারে।[৩৪]

২৩ আগস্ট, ১৯৮২ নাইজারের রাজধানী নিয়ামিতে শুরু হয় ১৩তম ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন। সম্মেলনে মহাসচিব হাবিব চাত্তি আফগানিস্তানের বেদনার্ত সমস্যার উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ. আর. শামস-উদ-দোহা অংশগ্রহণ করেন। তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামি উম্মাহর মধ্যে ঘনিষ্ট সহযোগিতার প্রয়োজনের ওপর জোর দিয়েছেন এবং ইসলামি বিশ্বের শান্তি, মৈত্রী ও সমৃদ্ধির জন্য তাদের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন বিভিন্ন সমস্যার ব্যাপারেও ন্যায়সঙ্গত সমাধান ইসলামি বিশ্বের সাফল্য। আমাদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোবলের ওপর নির্ভর করে। তিনি উল্লেখ করেন, মুসলিমবিশ্ব বর্তমানে ইতিহাসের এক সংকটজনক পর্যায় অতিক্রম করছে। আফগানিস্তানে বিদেশী সৈন্য মোতায়েনের কথা উল্লেখ করে দোহা বলেন, জাতিসংঘের প্রস্তাবনা অনুসারে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং বাইরের হস্তক্ষেপ ভিন্ন আফগান জনগণকে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে দেয়া একান্ত আবশ্যক।[৩৫]

১৬ অক্টোবর, ১৯৮২ ফিজিতে কমনওয়েলথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ.এম এরশাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলটি অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলন শেষে ইশতেহারে যেসব রাজনৈতিক বিষয় স্থান পায় তার মধ্যে রয়েছে, ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা ঘোষণা, আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার, বল প্রয়োগে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার

Dhaka University Institutional Repository

আহ্বান এবং জাতিসংঘের সনদ ও প্রস্তাব অনুযায়ী আলাদা আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সকল বিবাদ মিটিয়ে ফেলার আহ্বান।[৩৬]

ইসলামি সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব হাবিব চাত্তি ১৪ ডিসেম্বর ৪ দিনের সফরে ঢাকায় আসেন। মুসলিম বিশ্বের সমস্যাবলি নিয়ে জেনারেল এরশাদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী দোহার সাথে তিনি আলোচনায় মিলিত হন। তিনি বিশেষভাবে মধ্যপ্রাচ্য ও আফগানিস্তানের কথা উল্লেখ করে এগুলোকে মুসলিম বিশ্বের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে মন্তব্য করেন।[৩৭]

ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের খসড়া ঘোষণায় যুদ্ধ-বিধ্বস্ত আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের ভিত্তিতে আফগান সংকটের এক জরুরি রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানানো হয়। এতে সার্বভৌম দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও স্বাধীন দেশের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করার নীতির প্রতি সমর্থন জানানো হয়। আফগান সংকট যাতে আরও জটিল হয়ে না উঠে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে খসড়া ঘোষণায় সংযত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আর এ ঘোষণার সাথে বাংলাদেশ একাত্মতা ঘোষণা করে।[৩৮] বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ.আর শামস-উদ-দোহা থাইল্যাণ্ডে তিন দিনব্যাপী এক রাষ্ট্রীয় সফরে যান। সফর শেষে তিনি বলেন কম্পুচিয়া ও আফগানিস্তান প্রশ্নে বাংলাদেশ ৫টি নীতি গ্রহণ করেছে। এ নীতিমালা হচ্ছে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, হস্তক্ষেপ করা ও বলপ্রয়োগ না করা এবং বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা।[৩৯] সপ্তম জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বাংলাদেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের দু-দিনব্যাপী বৈঠক শুরু হয়। স্বাগতিক দেশ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পি. ভি নরসীমা রাও এতে যোগ দেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে কম্পুচিয়া ও আফগানিস্তান ইস্যুটি স্থান পায়।[৪০]

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দিন চৌধুরী দৃঢ়তার সাথে জোটনিরপেক্ষতার নীতিমালার প্রতি বাংলাদেশের অঙ্গীকারের কথা ঘোষণা করে বলেন, বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মৌলিক নীতিসমূহ সংরক্ষণ ও তা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বরাবরই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রেসিডেন্ট আহসান উদ্দিন ঢাকার বঙ্গভবনে মালদ্বীপের সফররত প্রেসিডেন্ট মামুন আব্দুল গাইয়ুমের সম্মানে ভোজসভায় ভাষণদানকালে বলেন আফগান পরিস্থিতি আমাদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হিসেবে বিরাজ করছে। এ দেশ থেকে অবিলম্বে এবং

Dhaka University Institutional Repository

শর্তহীনভাবে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার এবং এমন একটি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য আমরা পুনরায় আহ্বান জানাচ্ছি যাতে করে বাইরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই জনগণ নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়।[৪১]

৬ মার্চ, ১৯৮৩ জেনারেল এরশাদ ৭-১১ মার্চ অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য দিল্লি যান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের ইতিবাচক ও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি বলেন, জোটনিরপেক্ষতা আমাদের পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি। আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়া আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়। এ দু'টি দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আমাদের সব কিছু করতে হবে।[৪২] এইচ. এম. এরশাদ ৮ মার্চ জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দেন। বিশ্ব পরিস্থিতির পর্যালোচনা প্রসঙ্গে জেনারেল এরশাদ আফগানিস্তান ও কম্পুচিয়ার উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য হিসেবে এ দু'টি দেশ থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার নিশ্চিত করতে আমাদের সম্ভাব্য সব কিছুই করা দরকার। সংশ্লিষ্ট দেশের জনগণের বাইরে কোনো রকম বাঁধা বা হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারে।[৪৩]

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ ৭ মার্চ, ১৯৮৩ সালে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণদানকালে বলেন যে, বিশ্বকে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য আরো নিরাপদ করে তুলতে হবে। তিনি সম্মেলনে আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়ে বলেন, অপর দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতির চরম বরখেলাপ। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতির প্রতি আস্থাবান বাংলাদেশ মনে করে যে, আফগানিস্তানের জনগণ নিজেদের সমস্যা নিজেরা মোকাবেলায় সক্ষম এবং ঐ দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের লংঘন করেছে এবং আঞ্চলিক শান্তি ও বিশ্বশান্তির প্রতি মারাত্মক হুমকি সৃষ্টি করেছে।[৪৪]

নয়াদিল্লিতে পাঁচদিনব্যাপী জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন শেষে যে সব প্রস্তাব অনুমোদিত হয় তার অন্যতম ছিলো আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার। আফগান সমস্যা প্রসঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটনিরপেক্ষ জাতির পক্ষে অংশ নিয়েছে এবং সমস্যা সম্পর্কে শীর্ষ সম্মেলনে যে সমঝোতা হয় তা বহুলাংশে বাংলাদেশের ঘোষিত নীতিরই পরিপূরক।[৪৫]

২৯ নভেম্বর, ১৯৮৩ নয়াদিল্লিতে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সরকার প্রধানদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম বিষয় ছিলো আফগান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান এবং দেশটি থেকে সমস্ত বিদেশী সৈন্যের প্রত্যাহারের আহ্বান। বাংলাদেশ উক্ত দাবিগুলোর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। শীর্ষ বৈঠকের চূড়ান্ত ইশতেহারে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য জরুরী প্রচেষ্টা এবং আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে অটল থাকার আহ্বান জানানো হয়।[৪৬]

৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ ঢাকায় শুরু হয় চতুর্দশ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন। বাংলাদেশে এ ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন এই প্রথম। বাংলাদেশসহ মোট ৪১টি মুসলিম রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এতে যোগ দেন। এ সম্মেলনে যে সব বিষয় আলোচিত হয় তার মধ্যে অন্যতম হলো আফগান ইস্যু।[৪৭] বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন, ঢাকা, ১৯৮৩ বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য সাধন, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহার এবং আফগান জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নে চতুর্দশ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এক প্রস্তাব স্থান পায়। রাজনৈতিক কমিটিতে পাকিস্তান প্রস্তাবটি উথাপন করে। প্রস্তাবের সমর্থনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি এ ব্যাপারে বাংলাদেশের নীতি ও ভূমিকা পুনরায় উল্লেখ করে বলেন, আফগানিস্তান থেকে বিদেশী সৈন্য অবিলম্বে প্রত্যাহার করে সে দেশের জনগণকে তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণের সুযোগ দিতে হবে। তিনি আরো বলেন, আফগানিস্তানের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানই বাংলাদেশের কাম্য।[৪৮]

২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭ থেকে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বৈঠক শুরু হয়। এতে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে আফগান সমস্যাসহ মুসলিম বিশ্বের অপরাপর সমস্যা আলোচিত হয়।[৪৯] স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ এবং জোটনিরপেক্ষ

Dhaka University Institutional Repository

আন্দোলনের সদস্য হিসেবে আফগানিস্তান প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতি অত্যন্ত পরিস্কার, দ্ব্যর্থহীন ও বলিষ্ঠ। বাংলাদেশ চায় আফগানিস্তান থেকে সকল বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নেয়া হোক, সেদেশের জনগণকে দেয়া হোক নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার। প্রত্যেক জাতির অবাধ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের নিশ্চয়তার উপরই বিশ্বের স্থায়ী শান্তি এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নির্ভরশীল।[৫০] ২৪ মার্চ, ১৯৮৮ সপ্তদশ ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনের ভাষণে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী ইসলামি বিশ্বে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যের উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি সম্মেলনে আফগানিস্তান থেকে অবিলম্বে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের ব্যাপারে জোর বক্তব্য রাখেন।[৫১]

রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। বাংলদেশ ও আফগানিস্তান উভয়ই মুসিলম উম্মাহর অংশীদার হওয়াতে উভয়ের ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনা প্রায় একই রকম। আফগানিস্তনের রুশ আগ্রাসনকে মুসলিম দেশসমূহ মুসলিম উম্মাহর উপর আঘাত বলে ধরে নিয়েছে। আর বাংলাদেশ এ চিন্তাধারার বাইরে নয়। তাইতো রুশ আগ্রাসন ও তাদের কর্মকাণ্ডকে প্রতিনিয়ত প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন।

বাংলাদেশের সরকার ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন আফগান ইস্যুতে সোচ্চার ছিলো। বাংলাদেশে আফগান মুজাহিদদের সমর্থনে সপ্তাহ পালন করা হয়। আফগান মুজাহিদদের পক্ষে সংগঠন তৈরি করা হয়। এসব বিষয় আফগান ইস্যুতে বাংলাদেশের মানুষের সহমর্মিতারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশ-আফগান মুজাহিদ সংহতি পরিষদের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তাগণ আফগানিস্তানের রুশীয় লোমহর্ষক নির্যাতনের বর্ণনা এবং দেশবাসীকে এর প্রতিবাদ জানানোর জন্য আহ্বান করেন।[৫২] বাংলদেশ মুসলিম লীগের আহ্বায়ক বিচারপতি বি.এ. সিদ্দিকী আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতির ষষ্ঠ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেয়া এক বিবৃতিতে আফগান মুজাহিদদের সংগ্রামের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেন। তিনি আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যের উপস্থিতিকে এ অঞ্চলের

Dhaka University Institutional Repository

শান্তির জন্য হুমকি বলে বর্ণনা করেন। ক্রিসেন্ট সোসাইটিও অবিলম্বে আফগানিস্তান হতে রুশ সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।[৫৩]

আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় ২৭ ডিসেম্বর বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল আয়োজিত সভায় বক্তারা সোভিয়েত আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েতের মানবতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিশ্ব বিবেককে উৎকণ্ঠিত করেছিলো। ইসলামি ছাত্রশিবির আফগান মুক্তিকামী জনতার সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।[৫৪]

জাতীয় পার্টি আফগান দিবস উপলক্ষ্যে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের দাবি সত্ত্বেও বছরের পর বছর ধরে আফগানিস্তান বিদেশী নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আছে। সভায় বিশ্ব বিবেককে ঐক্যবদ্ধভাবে আফগান জাতির পাশে দাঁড়িয়ে তাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল, ইসলামি ছাত্রশিবির আফগান দিবস উপলক্ষ্যে (২৭ ডিসেম্বর) প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। এসব সভায় অবিলম্বে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়।[৫৫]

আফগানিস্তানের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে বাংলাদেশের আটটি দল এক বিবৃতিতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পথ পরিহার করে আফগান সরকারের ঘোষিত নীতি অনুযায়ী আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য সকল পক্ষের প্রতি আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে পাকিস্তান মুজাহিদদের প্রবাসী সরকার গঠনের প্রচেষ্টাকে জেনেভা চুক্তির বরখেলাপ হিসেবে মন্তব্য করে বলা হয় যে, জেনেভা চুক্তি মোতাবেক আফগান সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান ও ব্যাপক ভিত্তিক সরকার গঠনই একমাত্র কাম্য।[৫৬] বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আফগান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানায়। পার্টির এক

Dhaka University Institutional Repository

বিবৃতিতে বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদ ও পাকিস্তানের মদদপুষ্ট তথাকথিত মুজাহিদদের কার্যকলাপ আফগান সঙ্কটের শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানকেই অসম্ভব করে তুলেছে অথচ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব, নিকোশিয়ায় অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ দেশের রাজনৈতিক ঘোষণা এবং সর্বোপরি জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত জেনেভা চুক্তি সমগ্র বিশ্ববাসীর আকাঙ্খা অনুযায়ী আফগান সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধানের পথ উন্মুক্ত করেছিলো। বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারও এ সকল ঘোষণা ও চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলো।[৫৭]

তৎকালীন সরকার জেনেভা চুক্তি মোতাবেক সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে আফগান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষপাতী ছিলো। আন্তর্জাতিক বিরোধের সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতির প্রতি আমাদের সংবিধানেই অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ রয়েছে। জাতিসংঘ, জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশ শক্তি প্রয়োগ পরিহার করে রাজনৈতিক সমাধানের নীতির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে।

কমিউনিস্ট পার্টি ন্যাপ, বাকশাল, ওয়ার্কার্স পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠন এবং বহু বুদ্ধিজীবীসহ গণতান্ত্রিক জনমত আন্তর্জাতিক চুক্তিতে শ্রদ্ধাশীল হয়ে আফগান সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে সহায়তা করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ও সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। আফগান জনগণের স্বার্থে, মুসলিম বিশ্বের স্বার্থে এবং সর্বোপরি বিশ্বশান্তির স্বার্থে অব্যাহত সংঘর্ষ নয় বরং বাংলাদেশ আফগানিস্তানে শান্তি ও সমঝোতা দেখতে চায়।[৫৮]

বাংলাদেশ সরকারের প্রতিক্রিয়া

ঢাকাস্থ আফগানিস্তানের চার্জ দ্যা এ্যাফেয়ার্স আব্দুল আহাদ ওয়ালামি ১০ আগস্ট, ১৯৮৬ ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আফগানিস্তান হতে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত অভিনন্দনযোগ্য। কারণ এর ফলে আঞ্চলিক উত্তেজনা প্রশমিত হবে।[৫৯] তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সাথে আফগানিস্তানের সম্পর্ক ভালো ও ভবিষ্যতে আরো ভালো হবে।

Dhaka University Institutional Repository

শিগগিরই দু'টি দেশের দূতের মর্যাদা রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে উন্নীত হবে।[৬০] আফগানিস্তান প্রশ্নে বাংলাদেশের নীতি অত্যন্ত পরিস্কার ও দ্ব্যর্থহীন। বাংলাদেশ সোভিয়েত আগ্রাসনের অবসান চায় এবং আফগানিস্তানে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করে।[৬১]

বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানের অবনতিকর পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কাবুলসহ দূতাবাস সাময়িকভাবে বন্ধের সিদ্ধান্ত নেয়। নিরাপত্তার অভাব বোধ করলে দূতাবাস কর্মচারীদেরকে দেশে ফিরে আসার জন্য কাবুলে নির্দেশ পাঠানো হয়। কাবুলসহ বাংলাদেশ দূতাবাসে তখন ১১ জন অত্যাবশ্যক কর্মচারী ছিলেন।[৬২]

অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নীতিতে আফগান সমস্যা ব্যাপকভাবে প্রভাব ফেলে। আফগান বিপ্লব বা আফগান স্টাইল বিপ্লব এসময় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। বাংলাদেশে এ সময় বিভিন্ন বক্তব্য ও পত্র-পত্রিকায় আফগান স্টাইল বিপ্লবের কথা শুনা ও দেখা যায়। আফগান স্টাইলের "বিপ্লব" কথাটি বলে একটি বিশেষ নামকরণ করা হয়েছে। এ বিশেষ নামকরণে মনে হচ্ছে এটা বিশেষ ধরণের বিপ্লব। এর যেন একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে। আফগানিস্তানের তৎকালীন ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে আফগান স্টাইলের বিপ্লব কথাটা বলা হয়েছে। আফগান স্টাইল বিপ্লবের অর্থ হল, সামরিক বাহিনীর লোকদের একটি প্রভাবশালী অংশ হাত করে দেশে সামরিক অভ্যুত্থান করা এবং তারপর দেশে আফগান পদ্ধতিতে কোনো বিদেশী শক্তির মদদ নিয়ে বিশেষ ধরনের শাসন প্রক্রিয়া চালু করা। সেই শাসন দেশের লোক পছন্দ করুক আর না করুক তা চাপিয়ে দেওয়া।[৬৩] এসময় বাংলাদেশে আফগান স্টাইলের বিপ্লব হতে পারে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনার উদ্রেক হয়। এ প্রসঙ্গে শাহ মোয়াজ্জেম বলেন, এক শ্রেণীর বিরোধী দল আফগান স্টাইল বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে সমাজে বিশৃংঙ্খলা ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। কিন্তু দেশের জনগণ তাদের সকল অশুভ চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেবে।[৬৪]

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে এরশাদ সরকারের সম্পর্ক জিয়া সরকারের প্রদর্শিত পথেই অগ্রসর হয়েছিলো। বিশেষ কোনো জটিলতা এ সময়ের সম্পর্কের ভেতর দেখা যায়নি। তবে তাঁর সময়কালে মুসলিম বিশ্বের দু'তিনটি সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশকে কৌশলী হতে হয়েছিলো। যার মধ্যে অন্যতম ছিলো আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব।

আফগানিস্তান নীতিটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অবস্থান ছিলো সোভিয়েত বিরোধী। আফগানিস্থানে সোভিয়েত দখলদারিত্ব ঘটার পর স্বভাবতই বাংলাদেশ জোরালো প্রতিবাদ জানায়। শুধু প্রতিবাদই জানায়নি; বিভিন্ন ফোরামে এর বিরুদ্ধে সোচ্চারও ছিলো। বহু বাংলাদেশী গোপনে আফগান মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ৩৯ এবং ৪০ তম অধিবেশনে আফগান প্রসঙ্গ উথাপন করে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তৃতার সময়। এতে সোভিয়েত বিরোধী অবস্থান আরো একবার প্রমাণিত হয়।

১৯৯০ সালের ডিসেম্বরে এক অভিনব গণ আন্দোলনের মুখে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যই ছিলো এ গণ আন্দোলনের রূপকার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো সর্বদাই এরশাদ সরকারের পতন চাইলেও কখনও ঐকমত্যে পৌছতে পারেনি। ১৯৯০ সালের শেষদিকে প্রথমবারের মতো বিরোধী জোটসমূহ এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে ঐকমত্যে উপনীত হয় যার পরিণতিতে এরশাদ সরকারের পতন হয়। আর এরশাদ সরকারের এ পতনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আফগান সম্পর্কের হঠাৎ বিচ্ছেদ ঘটে।

তথ্য নির্দেশ

১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্ব," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ১৫৭

২. *The Bangladesh Observer*, 25 March, 1982

৩. *Ibid.*, 15 March, 1982

৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

৫. *The Bangladesh Observer*, 19 June, 1983

৬. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৮

Dhaka University Institutional Repository

৭. Golam Mostafa, *National Interest and Foreign Policy: Bangladesh's Relation with Soviet Union and its Successor States* (Dhaka: The University Press Limited 1995), P. 135

৮. কাজী জাহেদ ইকবাল, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি, (১৯৭১-২০০১)*, (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২), পৃ. ৫৪; আরও দ্রষ্টব্য: ফারুক হাসান, *আকগান রণাঙ্গণ থেকে* (ঢাকা: ফারইয়াব প্রকাশনী, ১৯৯১), পৃ. ৫

৯. *সাপ্তাহিক রোববার*, পঞ্চদশ সংখ্যা (২য় খণ্ড), ১৯৮২-৮৩, পৃ. ৯-১২

১০. *দৈনিক বাংলা*, ৫ মে, ১৯৮২ ও ৮ মে, ১৯৮২

১১. *দৈনিক সংবাদ*, ২৯ আগস্ট, ১৯৮২

১২. *দৈনিক বাংলা*, ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

১৩. ঐ, ৮ ফেব্রুয়ারি , ১৯৮৩

১৪. ঐ, ৮ ফেব্রুয়ারি , ১৯৮৩

১৫. ঐ, ১১ ফেব্রুয়ারি , ১৯৮৩

১৬. ঐ, ১০ আগস্ট, ১৯৮৩

১৭. *The Bangladesh Times,* 10 August, 1983

১৮. *দৈনিক বাংলা*, ৯ জানুয়ারি, ১৯৮৮

১৯. ঐ, ২৭ মার্চ, ১৯৮৮

২০. ঐ, ২৮ মে, ১৯৮২

২১. *The Bangladesh Observer,* 9 Octover, 1982

২২. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ নভেম্বর , ১৯৮২

২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৮৩

২৪. *The New Nation*, 16 March, 1984

২৫. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৮৪। আরও দ্রষ্টব্য: *সাপ্তাহিক একতা*, ঢাকা, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৪

২৬. *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৮৬

২৭. *দৈনিক বাংলা*, ১২ নভেম্বর, ১৯৮৭

২৮. ঐ, ১১ নভেম্বর, ১৯৮৭

২৯. ঐ, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

৩০. ঐ, ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৮

৩১. ঐ, ৬ নভেম্বর, ১৯৮৮

৩২. *দৈনিক সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি, ১৯৮৯

৩৩. *দৈনিক বাংলা*, ৫ জুলাই, ১৯৮২

৩৪. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ জুলাই, ১৯৮২ এবং ২০ জুলাই, ১৯৮২

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. *দৈনিক বাংলা*, ২৩ আগস্ট, ১৯৮২ এবং ২৭ আগস্ট, ১৯৮২

৩৬. *ঐ*, ২০ অক্টোবর, ১৯৮২

৩৭. *ঐ*, ১৪ ডিসেম্বর , ১৯৮২

৩৮. *দৈনিক স্বদেশ*, ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

৩৯. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

৪০. *ঐ*, ৪ মার্চ, ১৯৮৩

৪১. *ঐ*, ৪ মার্চ, ১৯৮৩

৪২. *ঐ*, ৭ মার্চ, ১৯৮৩

৪৩. *ঐ*, ৯ মার্চ, ১৯৮৩

৪৪. *ঐ*, ১০ মার্চ, ১৯৮৩

৪৫. *দৈনিক সংবাদ*, ১২ মার্চ, ১৯৮৩

৪৬. *দৈনিক বাংলা*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

৪৭. *সাপ্তাহিক রোববার*, ৬ষ্ঠ বর্ষ (১ম খণ্ড), ১৫ তম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৩, পৃ. ৯

৪৮. *দৈনিক বাংলা*, ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩ এবং ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

৪৯. *ঐ*, ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭

৫০. *ঐ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৮৮

৫১. *ঐ*, ২৭ মার্চ, ১৯৮৮

৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৬ নভেম্বর, ১৯৮৪। আরও দ্রষ্টব্য: *সাপ্তাহিক একতা*, ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৪

৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

৫৪. *ঐ*, ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

৫৫. *ঐ*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

৫৬. *ঐ*, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

৫৭. *সাপ্তাহিক একতা*, ২০ এপ্রিল, ১৯৮৯

৫৮. *ঐ*, ২১ এপ্রিল, ১৯৮৯

৫৯. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ আগস্ট, ১৯৮৫

৬০. *দৈনিক সংবাদ*, ২৬ অক্টোবর, ১৯৮৬

৬১. *দৈনিক বাংলা*, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

৬২. *দৈনিক সংবাদ*, ৩ জানুয়ারি, ১৯৮৯

৬৩. মোহাম্মদ সোলায়মান, *পরাশক্তি ও আফগানিস্তান* (চট্টগ্রাম: জেওর প্রকাশনী, ১৯৮৬), পৃ. ১৪২, ১৪৪; আরো দ্রষ্টব্য: *সাপ্তাহিক একতা*, ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮১

৬৪. *দৈনিক বাংলা*, ১৯ আগস্ট, ১৯৮৭

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের অতীত ও বর্তমান দিক বিবেচনা করলে দেখা যায় বর্তমানে দু'টি দেশের মধ্যে পূর্বের ন্যায় সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় অতীতে দু'টি দেশের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো। আজকের বাংলাদেশ পূর্বে ভারতীয় উপমহাদেশেরই একটি অংশ ছিলো। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তনে যে সকল বীর এ অঞ্চলে এসেছিলেন তাঁরা মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন বেশি লোক। উল্লেখ্য, গ্রিক ও পারসিকরা ভারতবর্ষে আগমনের পথ হিসেবে আফগানিস্তানকেই ব্যবহার করেছে। ফলে অতীতকাল থেকেই এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আফগান তথা মধ্য এশিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীতে ঔপনিবেশিক শাসনামলে বাংলাদেশ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো একটি অধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলে বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রথমে পূর্ববাংলা ও পরে পূর্বপাকিস্তান থাকাকালীন সময়েও দু'টি দেশের মধ্যে মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। আবার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আফগানিস্তান বাংলাদেশকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে। কিন্তু বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায়।

বখতিয়ার খলজির মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়। বাংলা তথা ভারতে যাঁরা মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন করেন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন জাতিতে তুর্কি। যেমন সুলতান মাহমুদ, মুহাম্মদ ঘুরি, কুতুব উদ্দিন আইবক, বখতিয়ার খলজি এবং তাঁদেরই অনুসারীরা। বর্তমান বিশ্বের মানচিত্রে তুর্কিস্তানটি ব্যাকট্রিয়া অঞ্চল হিসেবে পরিচিত যাকে আফাগান- তুর্কিস্তান বলা হয়। তুর্কি বংশোদ্ভূত আফগান বীররাই বাংলা তথা ভারতবর্ষ শাসন করেছেন দীর্ঘ দিন। ফলে এ অঞ্চলে নৃতাত্ত্বিক, ভাষা, ইতিহাস ও ঐতিহ্যে আফগান প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এদেশে মুসলিম সংস্কৃতির ধারক হিসেবে আমরা যে সব ব্যক্তির কথা আজও

Dhaka University Institutional Repository

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি তাঁদের অনেকেই আফগানিস্তান ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। উদাহরণস্বরূপ আমরা কবি ফেরদৌসি, বায়েজীদ বোস্তামী, আনছারী, ফারুকী, আমির খসরু ও জামির নাম উল্লেখ করতে পারি।[১]

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরও আফগানিস্তানের সাথে আমাদের একটি সুসম্পর্ক ছিলো। আফগানিস্তানের মোট ভূসীমা ৫,৫২৯ কিলোমিটারের মধ্যে পাকিস্তানের সাথেই রয়েছে ২,৪৩০ কিলোমিটার।[২] ভূসীমার একটি বিরাট অংশ পাকিস্তানের সাথে থাকায় দু'টি দেশের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক। তবে পাকতুনিস্তান (পশতু ভাষাভাষী অঞ্চল) সমস্যার কারণে যদিও দু'দেশের মধ্যে কখনো কখনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে টানাপোড়েন লক্ষ্য করা যায় তবুও অন্যান্য দিক যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদির জন্য দু'দেশের মধ্যে মোটামুটি সুসম্পর্ক বজায় ছিলো। তৎকালীন বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু'টি শিবিরই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) যথাসাধ্য চেষ্টা করে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে তাদের নিজ নিজ প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠা করতে। প্রভাব বলয় সৃষ্টির ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানে মার্কিন বলয় এবং আফগানিস্তান ও ভারতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভাব বিস্তার করে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান দু'টি ভিন্ন বলয়ে অবস্থান করার ফলে দু'টি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি লক্ষ্য করা যায়। পাকতুনিস্তান সমস্যা ও মার্কিন-সোভিয়েত প্রভাবের কারণে যদিও পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়, তবুও পূর্বের বাণিজ্যিক সম্পর্ক, কৃষ্টিকালচারের সম্পর্ক মোটামুটি অটুট থাকে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সময় অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও আফগানিস্তান বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে সহায়তা করে। হয়তো পাকিস্তানের সাথে আফগানদের রাজনৈতিক টানাপোড়েন সম্পর্কের কারণেই এটা করেছিলো আফগানিস্তান। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরও আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সুসম্পর্ক বজায় থাকে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর দেশটি তার জাতীয় স্বার্থের কারণে প্রাথমিক পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি অনুশীলন শুরু করে। আফগানিস্তান ও

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব থাকার কারণে দু'টি দেশের মধ্যে প্রতিনিধি গমনাগমন শুরু হয়। ফলে সুদূর প্রাচীনকালের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটি সুসম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে।

বর্তমানে বাংলাদেশ-আফগানিস্তান সম্পর্ক খুব বেশি প্রসারিত নয়। সুদূর প্রাচীনকাল থেকে আফগানিস্তান ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো স্বাধীনতা উত্তরকালে বিশেষত মুজিব আমলের পর থেকে তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক হ্রাস পাওয়ার পেছনে আমরা কিছু কারণকে দায়ী করতে পারি। প্রথমত, দেখা যায় যে, মুজিব আমল শেষ হওয়ার পরপরই সোভিয়েত মদদপুষ্ট আফগানিস্তানের উপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমতে থাকে। একই সময়ে ক্রমান্বয়ে মুসলিম বিশ্ব, চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সাথে আফগানিস্তানের যে সকল বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি হয়[৩] তা আর আলোর মুখ দেখেনি। তার কারণ হিসেবে সর্দার দাউদ ও শেখ মুজিবর রহমানের অকাল মৃত্যুকে দায়ী করা যায়। শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে যে ডানপন্থী সরকার গঠিত হয় তা থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান ও এরশাদ আমলে আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক কমতে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর আফগানিস্তানের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক তাদের নিজস্ব ব্যাপারে পরিণত হয়। পাকিস্তানের সাথে আফগানিস্তানের একটি বিরাট ভূসীমার কারণে দু'টি দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে খাইবারপাশ গিরিপথ ও হিন্দুকুশ পর্বত ব্যবহার করা হতো। পাকিস্তানের পেশোয়ার ও আফগানিস্তানের কিয়দংশ নিয়ে পাকতুনিস্তান গঠিত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ জনসাধারণের ভাষা পশতু। তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে একই ধারা লক্ষ্য করা যায়। এদিক থেকে বিবেচনা করলে আফগানিস্তান ও অখণ্ড পাকিস্তান একই সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙ্গনের ফলে নতুন যে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ঐ সংস্কৃতির সাথে বাংলাদেশের তেমন কোনো সম্পর্ক রইলনা। তৃতীয়ত, আফগানিস্তান একটি ইসলামি রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে ধর্ম একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। এজন্য দু'টি দেশের পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক দীর্ঘদিন টিকে থাকেনি। চতুর্থত, দ্বিতীয়

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বব্যাপী যে শক্তি সাম্য নীতি (Balance of Power) জন্ম নেয় তাতে বিশ্ব দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে আফগানিস্তান নামক রাষ্ট্রটি রুশ প্রভাব বলয়ের অধীনে চলে যায়।[৪] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এদেশে রুশ বলয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

কিন্তু ১৯৭৫ পরবর্তীতে বাংলাদেশ মার্কিন মদদপুষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হতে থাকে। ফলে এ সময় (১৯৭৯ সালের ২৫ ডিসেম্বর) সকল আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি লঙ্ঘন করে আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন ও বারবাক কারমালের নেতৃত্বে আফগানিস্তানে রুশ মদদপুষ্ট সরকার গঠিত হয়। বাংলাদেশ এ সময় মার্কিন মদদপুষ্ট রাষ্ট্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সাথে গলা মেলাতে থাকে এবং আফগানিস্তানে রুশ অবস্থান ও রুশ সরকারের তীব্র বিরোধিতা করে। এজন্য আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক শীতল হতে থাকে। পঞ্চমত, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশ বেশি উৎসাহী হয়। যদিও এ আগ্রাসনে সৃষ্ট সমস্যা পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, কারণ পাকিস্তানের সাথে রয়েছে আফগানিস্তানের সীমানা। সৃষ্ট সমস্যায় প্রচুর আফগান শরণার্থী আশ্রয় নেয় পাকিস্তান সীমানায়। তবুও বাংলাদেশই বেশি সোচ্চার হয় তার বক্তব্য ও কর্মে। এক্ষেত্রে মনে করা হয় বাংলাদেশ অধিকতর উপযাজক হয়েছে শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কারণেই।[৫] বাংলাদেশ ওআইসিভুক্ত অন্যান্য মুসলিম দেশের মতো মধ্যপন্থী নীতি অবলম্বন না করে আদর্শিক দিকটি জলাঞ্জলি দিয়ে শুধু জাতীয় স্বার্থের কারণেই অধিকতর মার্কিন ও চীনা সাহায্য পাবার আশায় পুরোপুরি মার্কিন নীতি অবলম্বন করে। বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে একই কোয়ালে অবস্থান করে জাতিসংঘ, ইসলামি সম্মেলন সংস্থা, ন্যাম সম্মেলনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এ আগ্রাসনের তীব্র নিন্দা জানায়।[৬] এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ-আফগানিস্তানের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের শেষ তৎপরতাও নষ্ট হয়ে যায় এবং আফগানিস্তান ও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ক্রমান্বয়ে ঘোলাটে রূপ ধারণ করে। ষষ্ঠত, জিয়া আমলের শুরু থেকেই আফগানিস্তান-বাংলাদেশ বাণিজ্যিক সম্পর্ক হ্রাস পেতে থাকে এবং বর্তমানে এসে দেখা যায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। এর পেছনে যে কারণটি দায়ী করা যায় তা হলো দেশটিতে খনিজ সম্পদের অভাব ও দরিদ্রতা। মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশ যেমন সৌদি আরব, কুয়েত,

Dhaka University Institutional Repository

মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশ হতে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক ঋণ, সাহায্য ও খনিজ সম্পদ আমদানি করতে সক্ষম। তবে আফগানিস্তানে খনিজ সম্পদ থাকলেও তা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও ব্যয়ভার বহন করার মতো ক্ষমতা দেশটির নেই। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশ জনশক্তি রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। কিন্তু আফগানিস্তানে জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ বা সম্ভাবনা নেই। এজন্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাথে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের সম্পর্ক যেভাবে বাড়তে থাকে আফগানিস্তানের সাথে সম্পর্ক সেভাবেই কমতে থাকে।

বর্তমানে যদিও আফগানিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তেমন উল্লেখযোগ্য নয় তবুও দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে পূর্বের উষ্ণ সম্পর্কে ফিরে আসা সম্ভব। দু'টি দেশই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় এবং হাজার বছরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক থাকায় দু'টি দেশেরই ছিলো অভিন্ন ঐতিহ্য। পূর্বে আফগানিস্তান অখণ্ড ভারতবর্ষের অধীন ছিলো। আর অখণ্ড ভারতবর্ষেরই অংশ ছিলো বাংলাদেশ। ভৌগোলিকদের কাছে ইরানি মালভূমি নামে পরিচিত যে উচ্চ অঞ্চল তারই পূর্বাংশ আফগানিস্তান।[৭] মুসলিম সংস্কৃতি মূলত পারসিক সংস্কৃতিরই একটি ধারা। পারস্য ও আফগানিস্তান রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সংশ্লিষ্ট। অখণ্ড ভারতবর্ষের হাজার বছরের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় অখণ্ড ভারতবর্ষে আগমনকারী বীররা ঐ একই সংস্কৃতি বহন করে এনেছেন।

বিশ্বায়নের এই যুগে আমরা যদি বিশ্বব্যাপী সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ধারাবাহিকতায় মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা করি তাহলে আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ অভিন্ন মুসলিম সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে হারানো সম্পর্ক ফিরে পেতে পারে। বিশ্বায়নের যুগে সম্পর্কের অন্যতম একটি মাধ্যম গণমাধ্যম। গণমাধ্যমে দু'টি দেশের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে পূর্বের উষ্ণ সম্পর্কে ফিরে আসা সম্ভব। দু'টি দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে বুদ্ধিজীবী বিনিময়, প্রতিনিধি গমনাগমন ও শুভেচ্ছা সফরের মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্পর্ক ও মেধার আদান প্রদানের মাধ্যমে একটি হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। আফগানিস্তানে আজ পর্যন্ত তেমন কোনো

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠেনি। তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও মাদ্রাসা ভিত্তিক। বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের মেধাবি ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার মাধ্যমে এদেশে আগমন ও শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। এতে দু'দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। মূলত একই ধর্ম, এক সময়ের একই ভূখণ্ড ও একই চিন্তাচেতনার অধিকারী দু'টি দেশ তাদের পূর্বের হারানো সম্পর্ক ফিরে পেয়ে একই বন্ধনে আবদ্ধ হোক এটা সবারই কাম্য।

তথ্য নির্দেশ

১. ড. মোঃ ফজলুল হক, *আফগানিস্তানের ইতিহাস*, (রাজশাহীঃ পাপিয়া সুলতানা কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৭), পৃ. ১

২. *ঐ*, পৃ. ২

৩. *দৈনিক বাংলার বাণী*, ২ জুলাই, ১৯৭৪

৪. Denis Wright, *Bangladesh Origien and Indian Decan Relation*, (Dhaka: Academic Publications, 1988), p. 261

৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ ও ইসলামী বিশ্ব," *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, অক্টোবর ১৯৮৪, পৃ. ৪৭-৪৮

৬. *The Daily Times*, 30 Decmeber, 1979

৭. ড. মোঃ ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়: পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১

ইউরেশিয়া অঞ্চলের মানচিত্র (৬৫০ সাল)

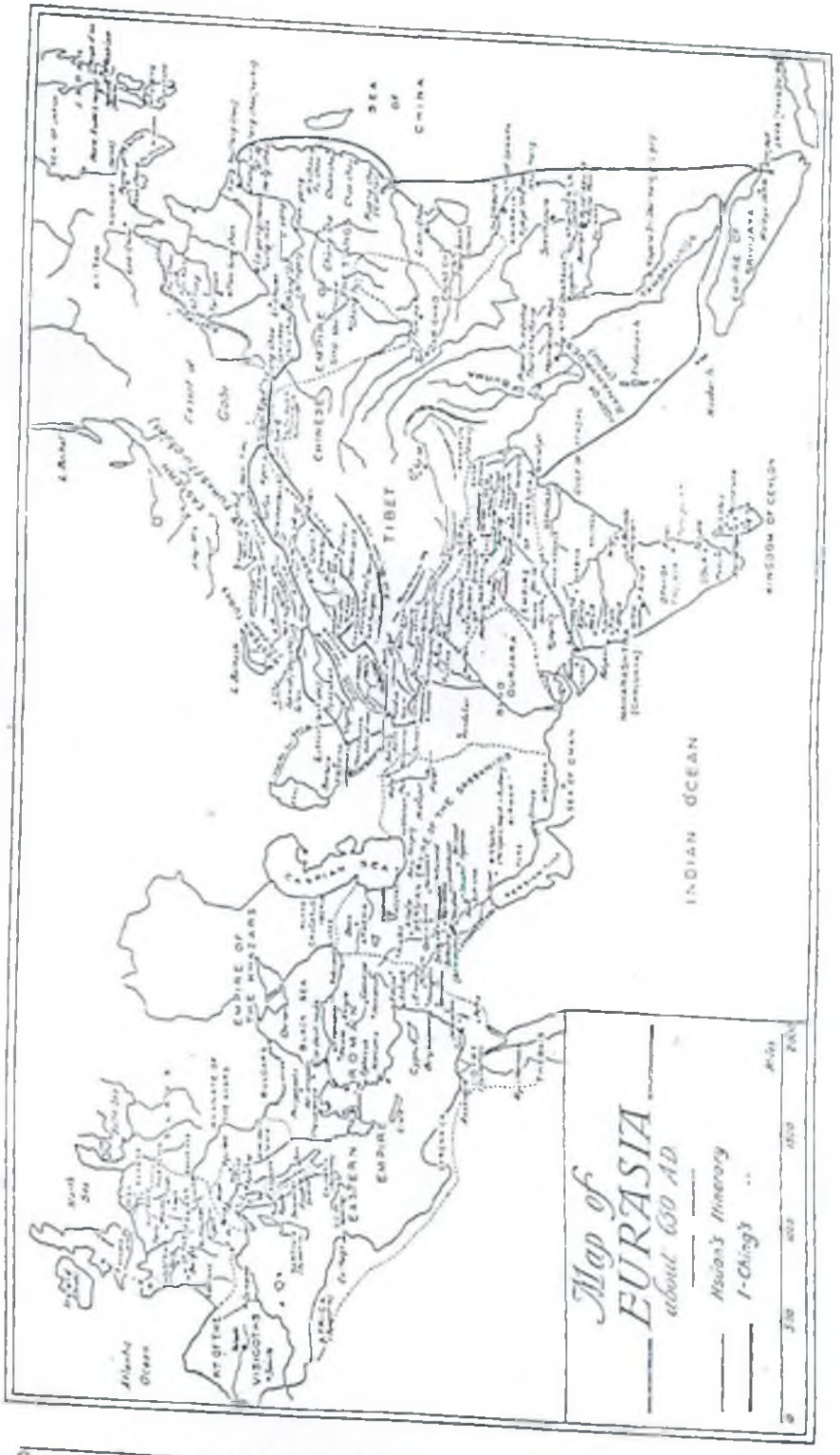

Source: P. Sykes, *A History of Afghanistan* (New Delhi: Orient Book, 1981)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২

মহানতি আলেকজাণ্ডার অধিকৃত অঞ্চলের মানচিত্র

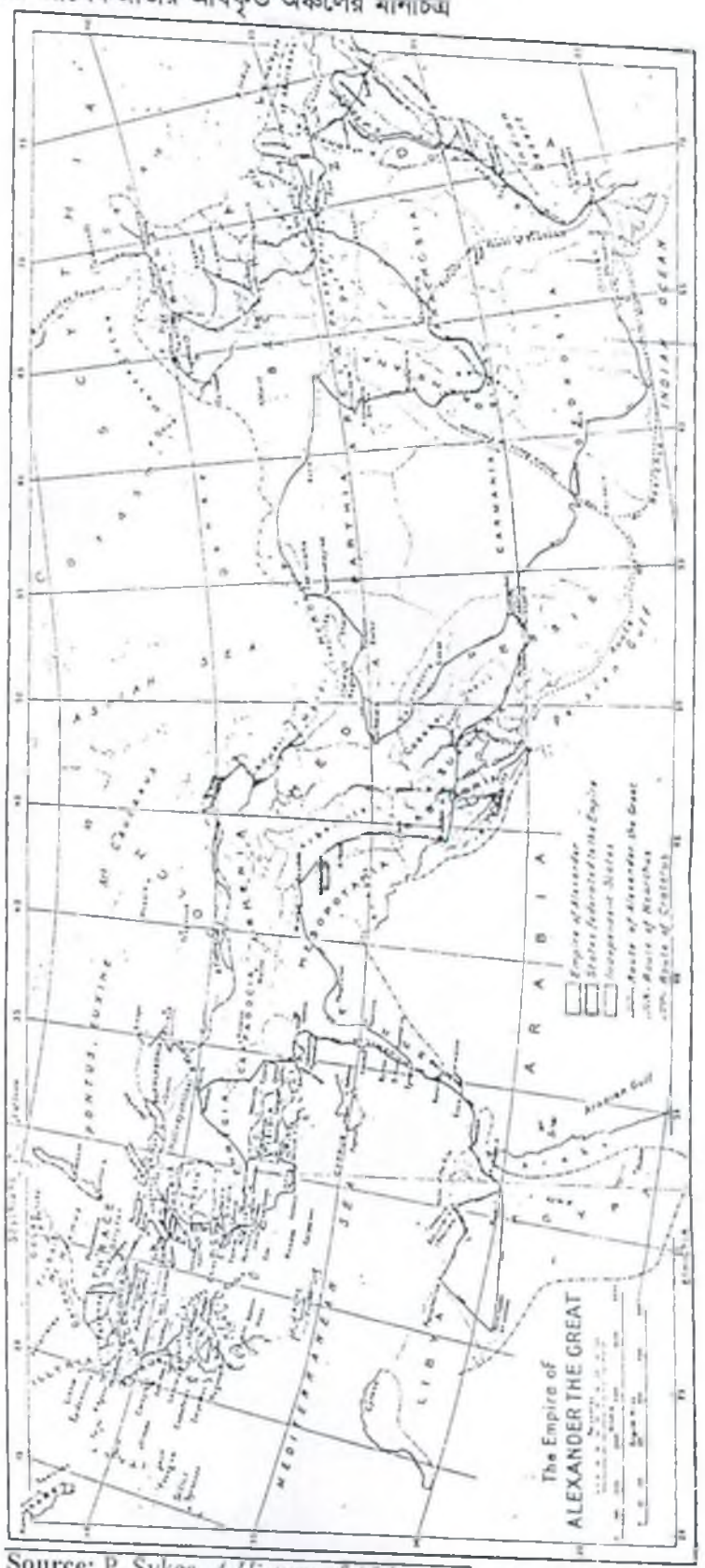

Source: P. Sykes, *A History of Afghanistan* (New Delhi: Orient Book, 1981)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসমূহের মানচিত্র (১২২১-১২৯০)

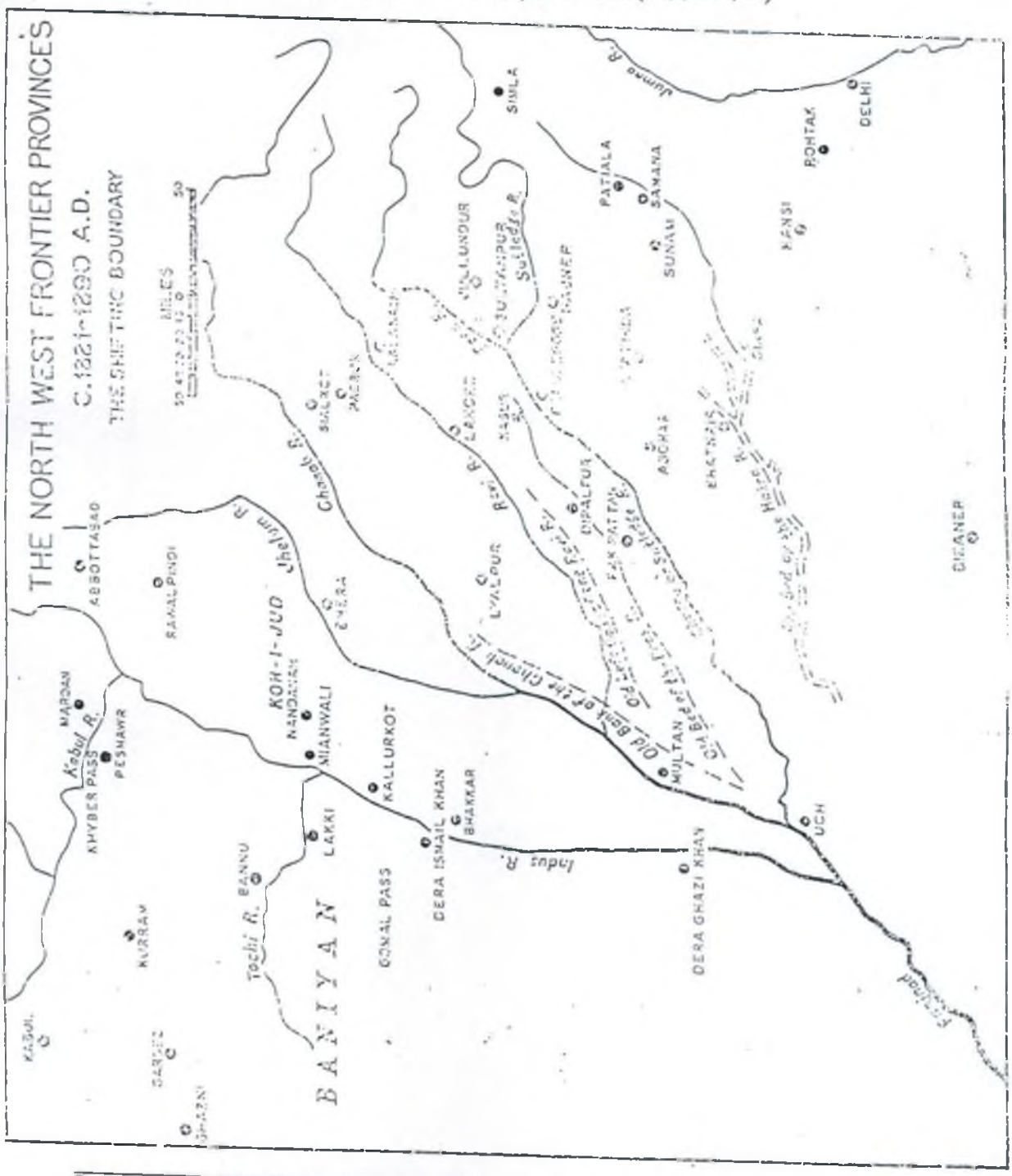

Source: A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India* (Allahabad: Vanguard Press, 1961)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৪

দিল্লি সাম্রাজ্যের মানচিত্র (১২৩৫ সাল)

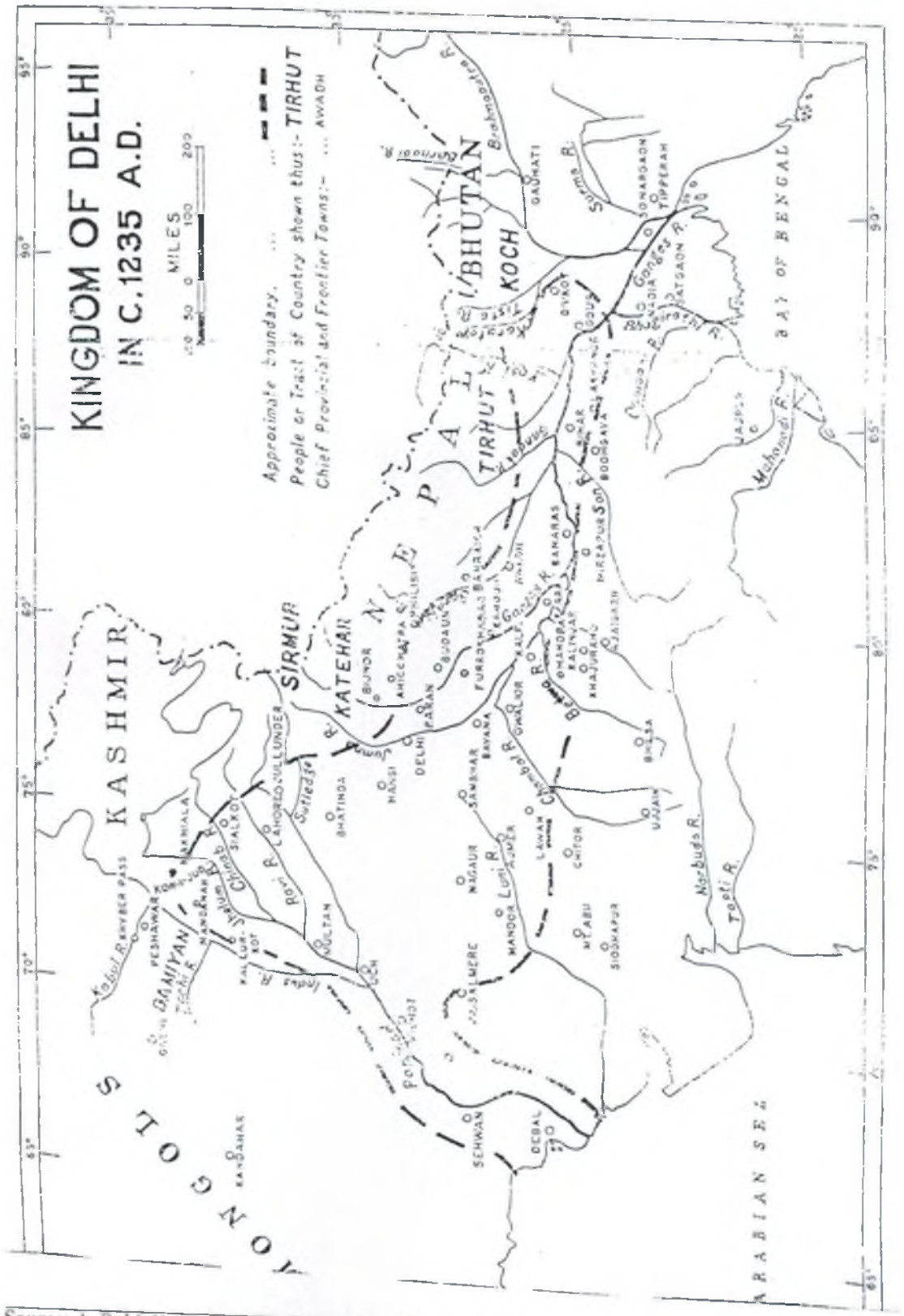

Source: A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India* (Allahabad: Vanguard Press, 1961)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৫

দিল্লি সাম্রাজ্যের মানচিত্র (১২৮০ সাল)

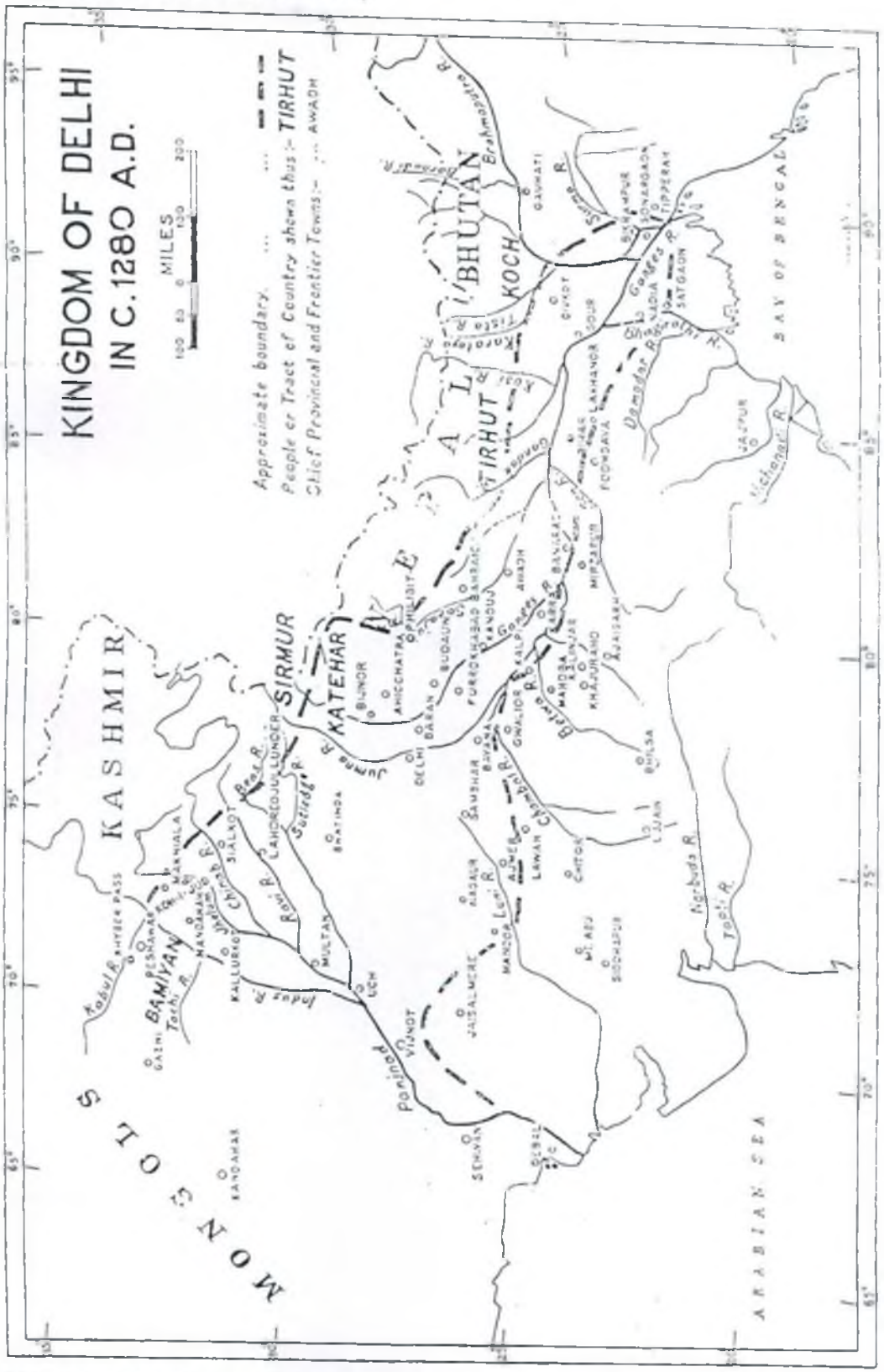

Source: A. B. M. Habibullah, *The Foundation of Muslim Rule in India* (Allahabad: Vanguard Press, 1961)

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৬

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়ে উত্তর ভারতের ১৬ টি প্রধান রাজ্য নির্দেশক মানচিত্র

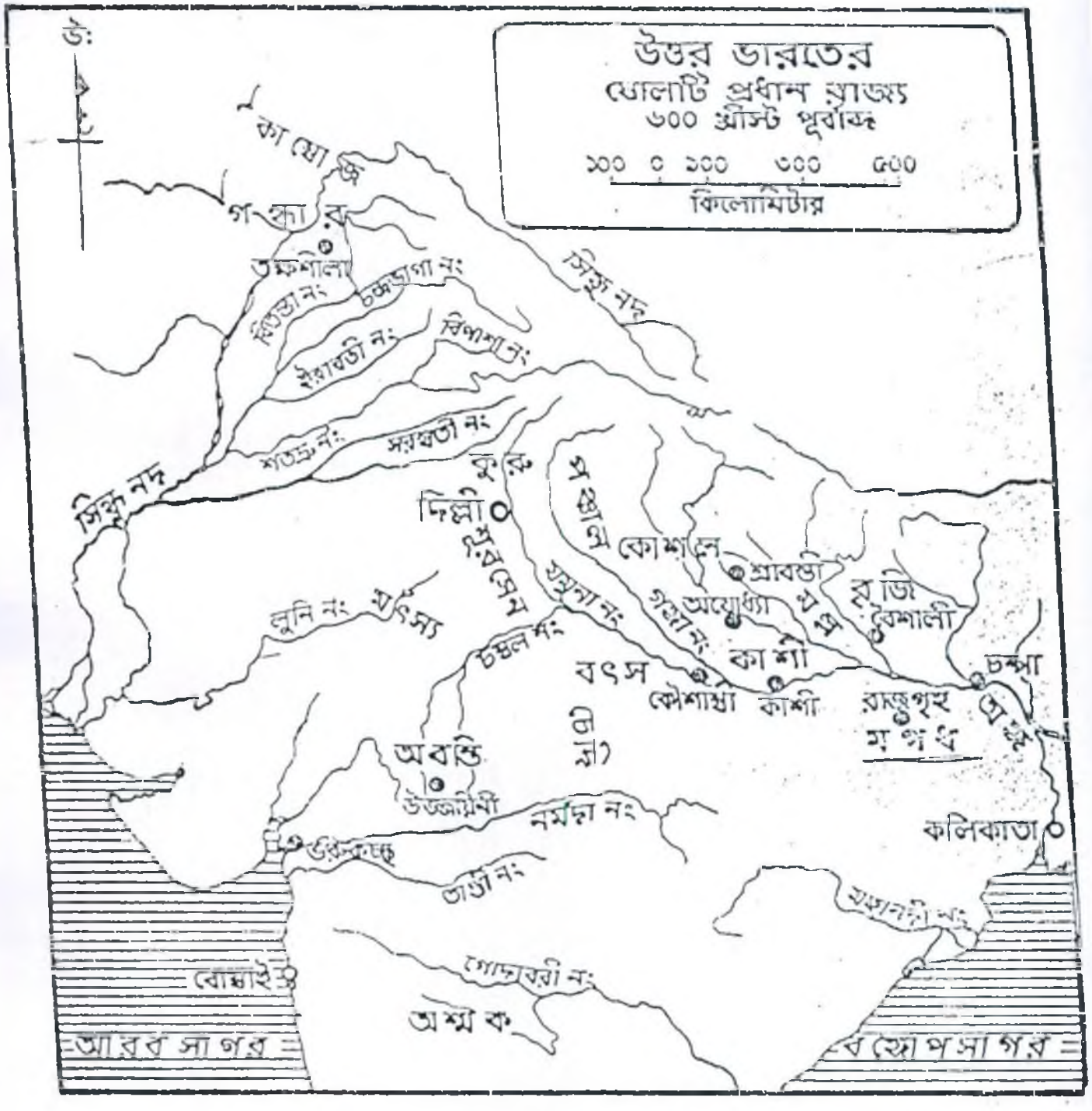

উৎস: রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ৪১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৭

মৌর্য যুগে ভারতীয় উপমহাদেশের মানচিত্র

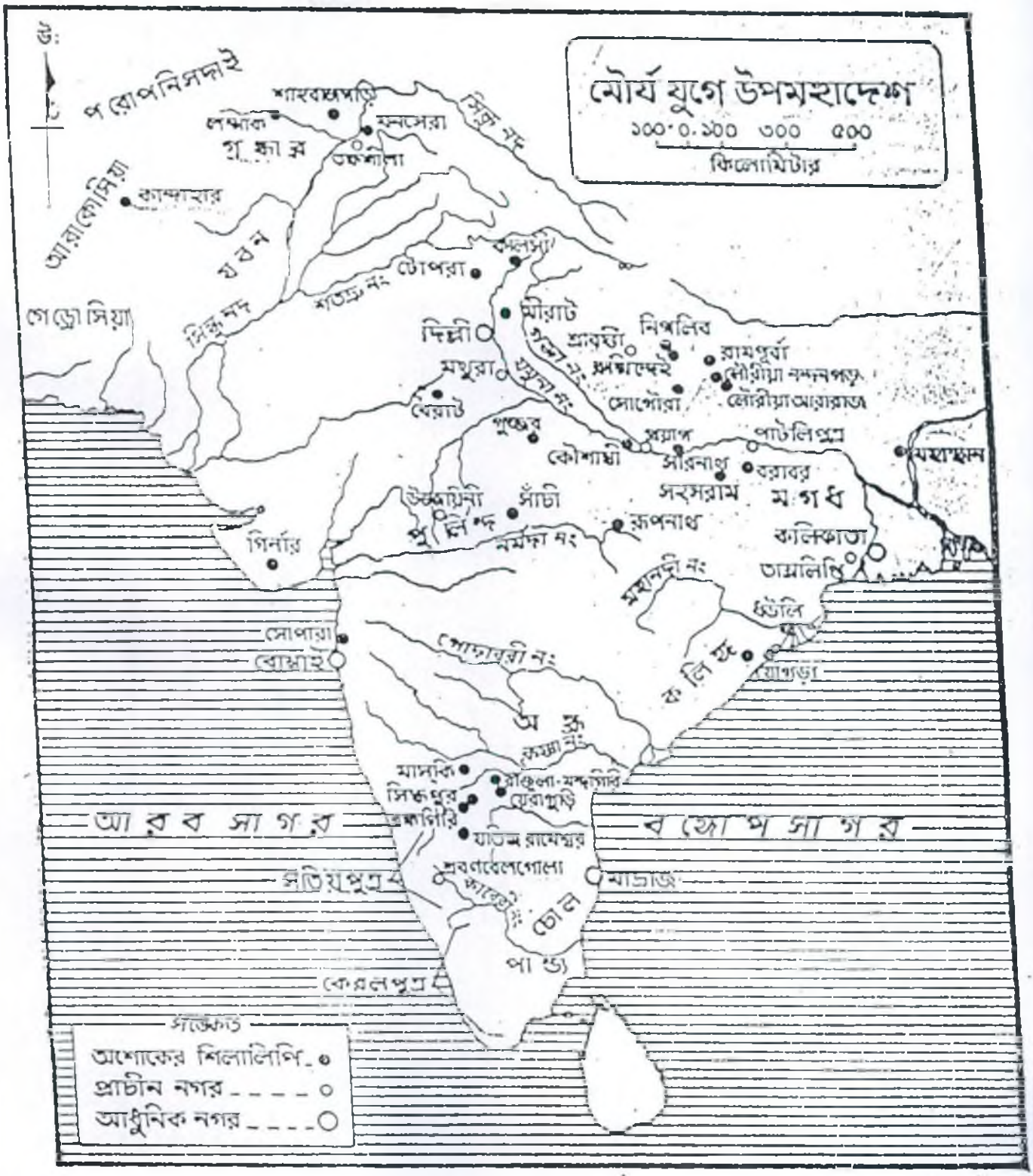

উৎস: রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৮

বাণিজ্য পথের মানচিত্র (পশ্চিম এশিয়া, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া)

উৎসঃ রোমিলা থাপার, ভারতবর্ষের ইতিহাস (কলিকাতাঃ ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০), পৃ. ৭২

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৯

আফগানিস্তানে দু'টি ফিল্ম নিয়ে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশ মিশন প্রধানের অনুমতিপত্র

"বাংলাদেশ ডাইরি" (৫ রিল) ও "রিফিউজি '৭১" (২ রিল) ফিল্ম ২ টি যাতে মুহাম্মদ নূরুল কাদির কূটনৈতিক মিশনে আফগানিস্তানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন, সেই জন্যে ২রা আগস্ট, ১৯৭১ বাংলাদেশ মিশন প্রধানের পক্ষে আনোয়ারুল করিম চৌধুরী নিম্নোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন।

ফোন: ৪৪-৫২০৮
৪৪-০৯৪১

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

Phone : 44-5208
44-0941

MISSION OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
9, CIRCUS AVENUE,
CALCUTTA-17

Dated: August 2, 1971.

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that Mr. Nurul Quader, a citizen of Bangladesh, is proceeding to Kabul as a member of Bangladesh delegation to Afghanistan. He is carrying with him two short documentaries titled "Bangladesh Diary" (5 reels) and "Refugee '71" (2 reels) for public exhibition to mobilize support in faveur of Bangladesh. He may be given all help and assistance in this connection.

MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
CALCUTTA

(Anwarul Karim Chowdhury),
for Head of Mission.

উৎস: নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৪৯১

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১০

বাংলাদেশ মিশন প্রধান আনোয়ারুল করিমের কূটনৈতিক মিশনে যাওয়ার অনুমতিপত্র

১১ই জুলাই, ১৯৭১ কলকাতায় বাংলাদেশ মিশন প্রধান-এর পক্ষে আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বিদেশে কূটনৈতিক মিশনে যাওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন। উক্ত চিঠির কপি এম.আর. সিদ্দিকী (সাবেক রাষ্ট্রদূত), মোল্লা জালালউদ্দিন (সাবেক মন্ত্রী), ড. কোরেশী, এম.এ. সামাদ (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী), আব্দুল মালেক (সাবেক স্পীকার) ও মুহাম্মদ নূরুল কাদিরকে দেওয়া হয়।

Phone { 44-5208 / 44 0941

MISSION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

9-CIRCUS AVENUE,
CALCUTTA-17

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ মিশন
৯, সার্কাস এ্যাভিনিউ
কলিকাতা-১৭

July 11, 1971.

FOR THE MEMBERS OF BANGLADESH DELEGATIONS GOING ABROAD.

On arrival at New Delhi, please contact the following persons :

(1) Mr. K.P.S. Menon, Joint Secretary, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.
Phone No: Office-371864 & Residence-383387

(2) Mr. Alfred Das, Director, Co-ordination, Ministry of External Affairs, Government of India, New Delhi.

(3) Mr. K.M. Shehabuddin, Bangladesh Representative, C-119, Anand Niketan, New Delhi. Phone No.626405.

Your accommodation, transportation, bookings and foreign exchange will be arranged by Mr. Das. Briefings will be provided by Mr. Menon.

For general assistance, please contact Mr. Shehabuddin.

(Anwarul Karim Chowdhury)
for HEAD OF THE MISSION

1. Mr. M.R. Siddiqi
2. Mr. Molla Jalaluddin
3. Dr. Qureshi
4. Mr. M.A. Samad
5. Mr. Abdul Malek
6. Mr. Nurul Qadir.

উৎস: নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৪৮৯

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১১

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলমের কূটনৈতিক মিশনে যাওয়ার জন্য তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেয়া চিঠি

২৯ জুন, ১৯৭১ মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম চাষী নিম্নোক্ত চিঠিটি আফগানিস্তানে কূটনৈতিক মিশনে যাওয়ার ব্যাপারে আব্দুস সামাদ আজাদকে (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) লিখেছিলেন। উক্ত চিঠির কপি আশরাফ আলী চৌধুরী, এম.এন.এ, মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী এবং মুহাম্মদ নূরুল কাদিরকে দেওয়া হয়েছিলো।

GOVERNMENT OF BANGLADESH
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
....

MUJIBNAGAR,
June 29, 1971.

Dear Mr. Abdus Samad,

I have the pleasure to inform you that the Government of Bangladesh have selected you to head a delegation to Afghanistan to mobilize opinion in support of our cause. Mr. Ashraf Ali Choudhury, MNA, Moulana Khairul Islam Bashori and Mr. Nurul Kadir, Advocate will accompany you as members of the delegation.

Please keep yourself in readiness to undertake the trip at short notice.

Yours sincerely,

(M. Alam)
Foreign Secretary.

Mr. M.A. Samad, MNA.

Copy to :-

1. Mr. A.A. Choudhury, MNA, for information and similar action.
2. Moulana Bashori, India Hotel, Calcutta for information and similar action.
3. Mr. Nurul Kadir Advocate, Park Court, Suite (1)-2, Amir Ali Avenue, Calcutta-17 for information & similar action.

(M. Alam)
Foreign Secretary.

উৎস: নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৪৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১২

নূরুল কাদিরকে পাঠানো বোম্বের ফিল্ম ডিভিশনের ডেপুটি চীফ প্রোডিউসার মি. পি. পার্টির টেলিগ্রাম

ভারতের বোম্বের ফিল্ম ডিভিশনের ডেপুটি চীফ প্রোডিউসার মি. পি. পার্টি এই টেলিগ্রামটি কলকাতার লেখক মুহাম্মদ নূরুল কাদিরের নিকট পাঠিয়েছিলেন। উক্ত টেলিগ্রামে দু'টি ফিল্ম আফগানিস্তানে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কলকাতার ফিল্ম ডিভিশনের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার মি. দাস গুপ্তের নিকট থেকে ডেলিভারী নেওয়ার যে অনুরোধ জানিয়েছেন তা নিম্নরূপ:

STATE. INLAND TELEGRAM EXPRESS

SHRI NURUL QUADIR
TELEPHONE 444642
CALCUTTA

THANKS FOR YOUR LETTER (.)
FILMS SENT TO DAS GUPTA BRANCH MANAGER FILMS DIVISION
CALCUTTA ON TWENTYEIGHTH JULY (.) REQUEST CONTACT HIM
FOR DELIVERY (.) LETTER FOLLOWS (.)

Not to be telegraphed: PATI
MINIFILMS

(P.PATI)
Dy. Chief Producer
Filme Division
24 Peddar Road,Bombay-26

No.4/18/71-SL
FILMS DIVISION
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

24 Peddar Road,Bombay 26
Dated the 30th July 1971

Copy by post in confirmation forwarded to Shri Md.Nurul Quadir, Advocate, "Park Court", Suit No.4, 2 Syed Amir Ali Avenue, Calcutta-17, for information.

(P.PATI)
Dy. Chief Producer

উৎস: নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ৬৫৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৩

নূরুল কাদিরকে দেয়া মাহবুব নাসরুল্লাহর দু'টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেয়ার একটি পত্র

নূরুল কাদিরকে আফগানিস্তানে যাওয়ার জন্য ২টি ডকুমেন্টারি ফিল্ম দেওয়ার সপক্ষে সেক্রেটারি জেনারেল মিসেস মাহবুব নাসরুল্লাহ যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তা নিম্নরূপ:

"যেহেতু মোহাম্মদ নূরুল কাদির ডিপ্লোমেটিক মিশনে আফগানিস্তান সফরে যাচ্ছেন, কাজেই তিনি যদি ভারত সরকারের মিনিস্ট্রি অব ইনফরমেশন এন্ড ব্রডকাস্টিং এর অধীনে নির্মিত ও বম্বের ফিল্ম ডিভিশন কর্তৃক প্রযোজিত দুইটি ডকুমেন্টারী ফিল্ম "ভাইরী অব বাংলাদেশ" (৫ রিল) এবং "রিফিউজি '৭১" (২ রিল) ভারতীয় এমব্লেম ও টাইটেল বাদ দিয়ে, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারেন। তাহলে তিনি তাঁর দায়িত্ব খুব ভালোভাবে পালন করতে পারবেন, যার ফলে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় সরকার ও জনগণ উপকৃত হবেন। কাজেই ভারত সরকারের অনুমতি নিয়ে, মহারাষ্ট্র বাংলাদেশ এইড কমিটির অর্থে উক্ত ফিল্ম দুইটি ক্রয় করে, ভারতীয় এমব্লেম ও টাইটেল বাদ দিয়ে নূরুল কাদিরকে উক্ত ফিল্ম দু'টি উপহার হিসেবে দেওয়া হোক।

উৎস: নূরুল কাদির, *নুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৮৩

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৪

আফগানিস্তানে প্রেরিত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি দলের প্রধান আব্দুস সামাদকে দেয়া পত্র

২৯ জুন, ১৯৭১ বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব মাহবুব আলম, বাংলাদেশের পক্ষে ডিপ্লোম্যাটিক মিশনে আফগানিস্তান যাওয়ার জন্য আব্দুস সামাদ (সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী) এর নেতৃত্বে আশরাফ আলী চৌধুরী (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ঢাকা ইনকাম ট্যাক্স বার এসোসিয়েশন), মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী (সভাপতি, উলেমা আওয়ামী লীগ) এবং নূরুল কাদিরকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ:

Government of Bangladesh
Ministry of Foreign Affairs

Mujibnagar
June 29, 1971.

Dear Mr. Abdus Samad,

I have the pleasure to inform you that the Government of Bangladesh have selected you to head a delegation to Afghanistan to mobilise opinion in support of our cause. Mr. Ashraf Ali Choudhury, MNA, Moulana Khairul Islam Jessori and Mr. Nurul Quadir, Advocate will accompany you as members of the delegation.

Please keep yourself in readiness to undertake the trip at short notice.

Your Sincerely,
(M. Alam)
Foreign Secretary.

Mr. M.A. Samad, MNA.

Copy to:
1. Mr. A.A. Choudhury, MNA, for information and similar action.
2. Moulana Jessori, India Hotel, Calcutta for information and similar action.
3. Mr. Nurul Quadir, Advocate, Park Court, Suite-4, 2 Syed Amir Ali Avenue, Calcutta-17 for information and similar action.

(M. Alam)

Foreign Secretary.

উৎস: নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯), পৃ. ১৩০

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৫

আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ্‌র সফর শেষে যুক্ত ইশতেহার

আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ্‌র দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফর শেষে যে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয় তাতে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান নীতির প্রতি অবিচল আস্থার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন। দু'দেশই উপমহাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উভয় দেশই বিরোধ ও শত্রুতামূলক ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে বলে মত প্রকাশ করেন। দু'টি দেশই জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী আর এজন্য রাজনৈতিকভাবে দু'টি দেশের মধ্যে অধিক মিল পরিলক্ষিত হয়। দু'টি দেশ নিজেদের সহায় সম্পদ দরিদ্র জনগণের মঙ্গলার্থে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চায় এবং বিরাজিত সকল প্রকার বিরোধ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চায়। শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য এসকল নীতি অবশ্যই স্বার্থক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উৎস: *দৈনিক সমাজ*, ৩ জুলাই, ১৯৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৬

প্রেসিডেন্ট দাউদের সফর শেষে যুক্ত ইশতেহার

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান তাদের ফুলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরো সম্প্রসারণের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদের ৩ দিনের সফর শেষে রোববার রাতে ঢাকায় প্রকাশিত এক যুক্ত ইশতেহারে একথা বলা হয়েছে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্যে বাংলাদেশের গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। যুক্ত ইশতেহারের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রের মাহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ দাউদ ১৯৭৫ সনের ১৪ থেকে ১৬ মার্চ বাংলাদেশে এক সরকারি সফরে আসেন। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জালালার, পরিকল্পনা মন্ত্রী আলী আহমদ খুররম ও উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. ওয়াজেদ আব্দুল্লাহ এবং আফগান সরকারের প্রবীণ কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদকে তাঁর সফরকালে বাংলাদেশের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ দু'দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের গভীর মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক, সমঝোতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতিচ্ছবি সম্বলিত এক বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান।

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়সহ অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসব আলোচনা পরিপূর্ণ সমঝোতা ও পারস্পারিক আস্থাপূর্ণ মৈত্রী ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনায় আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করেন বাণিজ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ খান জালালার, পরিকল্পনা মন্ত্রী আলী আহমদ খুররম, উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ, চার্জ-দ্য-এফেয়ার্স আব্দুল্লাহ কাদের।

আলোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করেন, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, বাণিজ্য ও বৈদেশিক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ।
আলোচনায় চলতি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং দু'দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ককে আরও সংহত ও জোরদার করার ব্যাপারে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মাননীয় অতিথিকে স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জনগণের সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে আফগান প্রেসিডেন্ট গভীরভাবে অভিভূত হন এবং নয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৫

আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ্‌র সফর শেষে যুক্ত ইশতেহার

আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্র মন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ্‌র দু'দিনব্যাপী বাংলাদেশ সফর শেষে যে যুক্ত ইশতেহার প্রকাশিত হয় তাতে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান নীতির প্রতি অবিচল আস্থার কথা পুনরায় ঘোষণা করেছেন। দু'দেশই উপমহাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। উভয় দেশই বিরোধ ও শত্রুতামূলক ক্ষতিকর অবস্থার পরিবর্তে ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে বলে মত প্রকাশ করেন। দু'টি দেশই জোটনিরপেক্ষ নীতির অনুসারী আর এজন্য রাজনৈতিকভাবে দু'টি দেশের মধ্যে অধিক মিল পরিলক্ষিত হয়। দু'টি দেশ নিজেদের সহায় সম্পদ দরিদ্র জনগণের মঙ্গলার্থে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে চায় এবং বিরাজিত সকল প্রকার বিরোধ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে চায়। শান্তিপূর্ণ বিশ্বের জন্য এসকল নীতি অবশ্যই স্বার্থক হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উৎস: *দৈনিক সমাজ*, ৩ জুলাই, ১৯৭৪

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৬

প্রেসিডেন্ট দাউদের সফর শেষে যুক্ত ইশতেহার

বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান তাদের ফুলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্রে আরো সম্প্রসারণের দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদের ৩ দিনের সফর শেষে রোববার রাতে ঢাকায় প্রকাশিত এক যুক্ত ইশতেহারে একথা বলা হয়েছে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্যে বাংলাদেশের গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছেন। যুক্ত ইশতেহারের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আমন্ত্রণে আফগানিস্তান প্রজাতন্ত্রের মাহামান্য রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ দাউদ ১৯৭৫ সনের ১৪ থেকে ১৬ মার্চ বাংলাদেশে এক সরকারি সফরে আসেন। আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টের সাথে ছিলেন বাণিজ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ খান জালালার, পরিকল্পনা মন্ত্রী আলী আহমদ খুররম ও উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. ওয়াজেদ আব্দুল্লাহ এবং আফগান সরকারের প্রবীণ কর্মকর্তাবৃন্দ।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদকে তাঁর সফরকালে বাংলাদেশের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ দু'দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের গভীর মৈত্রীপূর্ণ সম্পর্ক, সমঝোতা ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধের প্রতিচ্ছবি সম্বলিত এক বন্ধুত্বপূর্ণ আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ অভ্যর্থনা জানান।

আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সাথে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ও প্রধান আন্তর্জাতিক বিষয়সহ অভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসব আলোচনা পরিপূর্ণ সমঝোতা ও পারস্পারিক আস্থাপূর্ণ মৈত্রী ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়।
আলোচনায় আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্টকে সাহায্য করেন বাণিজ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ খান জালালার, পরিকল্পনা মন্ত্রী আলী আহমদ খুররম, উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ, চার্জ-দ্য-এফেয়ার্স আব্দুল্লাহ কাদের।

আলোচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করেন, উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, বাণিজ্য ও বৈদেশিক মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান কর্মকর্তাবৃন্দ।
আলোচনায় চলতি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং দু'দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ককে আরও সংহত ও জোরদার করার ব্যাপারে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং মনোভাবের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মাননীয় অতিথিকে স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালি জনগণের সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতিতে আফগান প্রেসিডেন্ট গভীরভাবে অভিভূত হন এবং নয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গঠনে

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর প্রচেষ্টা ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শোষণের ফলে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা সাফল্যজনকভাবে অতিক্রম করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের সুস্পষ্ট উদ্যম ও দৃঢ় সংকল্পের উচ্চ মূল্যায়ণ করেন।

আফগান প্রেসিডেন্ট ১৯৭৩ সালে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার পর থেকে সাধিত উন্নয়ন এবং প্রজাতন্ত্রের অধীনে গৃহীত প্রগতিশীল সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কর্মসূচী বর্ণনা করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি আফগান জনগণের গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে বলেন, প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদের প্রেরণা দানকারী নেতৃত্ব একটি নয়া সমাজ গঠনে তাদের সাফল্যে বাংলাদেশের জনগণ আনন্দিত।

উভয় পক্ষ যার প্রতি তাদের দেশ সব সময় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সেই জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের আত্মোৎসর্গের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। উভয় পক্ষ আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাব বাস্তবায়নে সর্বাধিক অবদান রাখার ব্যাপারে তাদের সংকল্পের কথা পুনরায় উল্লেখ করেন। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬ষ্ঠ বিশেষ অধিবেশনে একটি নয়া আন্তর্জাতিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ঘোষণা এবং কর্মসূচীর নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য জোটনিরপেক্ষ দেশসমূহের প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জানান। তাঁরা পুনরায় তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন যে, দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধনের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা জোরদার করতে হবে। উভয় পক্ষ আরো মতৈক্যে পৌঁছেন যে, আত্মনির্ভরশীলতা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান ফলপ্রসূ সম্ভাবনায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে অধিকতর সহযোগিতা অপরিহার্য।

ফলশ্রুতে অনুষ্ঠিতব্য পরবর্তী জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ বৈঠকের তাৎপর্য সম্পর্কেও উভয় পক্ষ মতৈক্যে পৌঁছেন। এশিয়া মহাদেশে অনুষ্ঠিতব্য প্রথম জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনকে সফল করার উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ তাঁদের প্রচেষ্টা সমন্বিত করার ব্যাপারে ঐকমত্যে উপনীত হন।

দক্ষিণ এশিয়ার চলতি ঘটনাবলি পর্যালোচনার পর উভয় রাষ্ট্রপ্রধান দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এ অঞ্চলের জনগণের বৈধ অধিকার ও আশা আকাঙ্খার প্রতি শ্রদ্ধা এবং সমঝোতা ও পারস্পারিক সদিচ্ছার মনোভাব নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে বিরাজমান সমস্যার সমাধানেই কেবল এ অঞ্চলে একটা শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে। এ প্রসঙ্গে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট উপমহাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের জন্য বাংলাদেশের গঠনমূলক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্ট দাউদের প্রাজ্ঞ রাজনীতিসুলভ উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

উভয়পক্ষ ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকায় পরিণত করার ঘোষণার দাবির প্রতি তাঁদের সমর্থনের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। তাঁরা আশা প্রকাশ করেন যে, জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরক্তি প্রদর্শিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উভয়পক্ষ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভ্রাতৃপ্রতিম আরব জনগণের ন্যায়ের সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সমর্থন ও সংহতির কথা পুনরায় ঘোষণা করেন। উভয়পক্ষ পুনরায় উল্লেখ করেন যে, ইসরায়েল কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার এবং প্যালেষ্টাইনি জনগণের সার্বভৌম জাতীয় অধিকারের বাস্তবায়নে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। তাঁরা প্যালেস্টাইনি জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি বলে পি.এল.ও-কে সাম্প্রতিক স্বীকৃতি দানকে অভিনন্দন জানান এবং জাতিসংঘ কর্তৃক পি.এল.ও. নেতৃবৃন্দকে বিশ্বফোরামে তাদের মতামত পেশ করার সুযোগ দানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

উভয়পক্ষ মুক্তি সংগাম এবং উপনিবেশবাদ, বিদেশী শাসন ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি তাঁদের সমর্থনের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

উভয়পক্ষ বাণিজ্য, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও বেসামরিক বিমান পরিবহনসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-আফগান সম্পর্কের ইতিবাচক উন্নতিকে স্বাগত জানান। দু'দেশের মধ্যে ফলপ্রসূ সহযোগিতার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারণের জন্য দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরায় ঘোষণা করেন।

উভয় রাষ্ট্রপ্রধান মতৈক্যে পৌছেন যে, নির্ধারিত ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতার একটি দ্বিপাক্ষিক কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে একটি অর্থনৈতিক ও পরিকল্পনা প্রতিনিধিদল শিগগিরই আফগানিস্তান সফর করবেন।

উভয় পক্ষ সন্তুষ্টির সাথে লক্ষ্য করেন যে, প্রেসিডেন্ট দাউদের সফর দু'দেশের মৈত্রী সম্পর্ক এবং ভ্রাতৃপ্রতিম সমঝোতা জোরদারকরণে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও স্থায়ী অবদান রেখেছে।

প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তাঁর সুবিধাজনক সময়ে আফগানিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জানান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি গভীর আনন্দের সাথে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

উৎস: *দৈনিক সংবাদ*, ১৭ মার্চ, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৭

১৯৭২-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ও আফগানিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন প্রতিনিধিদলের গমনাগমনের চিত্র

সন ও তারিখ	প্রতিনিধি (আগত)	প্রতিনিধি (গমনকারী)	আলোচ্য বিষয়/চুক্তি	পত্রিকা ও তারিখ
১৯৭২		ইকবাল আতাহার		The Bangladesh Observer, 14 March, 1975
৩-১০ জানু, ১৯৭৩		ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. এ. আর. মল্লিক	বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বিদ্বেষ এবং পাকিস্তানের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ার প্রসঙ্গ	দৈনিক স্বদেশ, ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩, The Bangladesh Observer, 14 March, 1975
মে, ১৯৭৩		পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দীন আহমদ		দৈনিক বাংলা, ১১ মার্চ, ১৯৭৬
মার্চ, ১৯৭৩	সুলায়মান		বাংলাদেশে আফগানিস্তানের দূতাবাস স্থাপন। আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য একটি যৌথ কমিশন গঠনের প্রস্তাব	The Bangladesh Observer, 02 March, 1973 দৈনিক আজাদ, ২ মে, ১৯৭৩
জুন, ১৯৭৩		ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. এ. আর. মল্লিক	কাবুল ও ঢাকাতে দু'দেশের কনস্যুলেট মিশন প্রতিষ্ঠা, সাংস্কৃতিক-বাণিজ্যিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে মাঝেমাঝে বৈঠকের সিদ্ধান্ত	দৈনিক বাংলা, ১৪ জুন, ১৯৭৩
২৯ জুন, ১৯৭৩	আফগান ডেপুটি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ		দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আলোচনা, বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর ও উপমহাদেশ পরিস্থিতি পর্যালোচনা	The Bangladesh Times, 3 June, 1974. The Morning News, 1 July, 1974, দৈনিক পূর্বদেশ, ২ জুলাই, ১৯৭৪
২৮ আগস্ট, ১৯৭৪		বাংলাদেশের অর্থ ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ	আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য প্রসঙ্গ	দৈনিক জনপদ, ১৪ মে, ১৯৭৫, দৈনিক আজাদ, ১৪ মে, ১৯৭৫
১৪ মার্চ, ১৯৭৫	আফগান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ দাউদ ও মন্ত্রী পরিষদের কয়েকজন সদস্য		ভারত মহাসাগরকে শান্তি এলাকা ঘোষণা, মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি, বিশ্ব পরিস্থিতি ও পরবর্তী ন্যাম সম্মেলনে নিজেদের করণীয় সম্পর্কে ঐকমত্য	দৈনিক আজাদ, ১৮ মার্চ, ১৯৭৫ দৈনিক বাংলার বাণী, ১৮ মার্চ, ১৯৭৫ The Bangladesh Observer, 16 March, 1975
১৪ মার্চ, ১৯৭৫	আফগান সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াহেদ আব্দুল্লাহ		সাংস্কৃতিক চুক্তি স্বাক্ষর	দৈনিক বাংলা, ১৬ মার্চ, ১৯৭৫
১৪ মার্চ, ১৯৭৫	আফগান বাণিজ্যমন্ত্রী খান মোহাম্মদ জালালার		বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর	দৈনিক আজাদ, ১৬ মার্চ, ১৯৭৫
জুন, ১৯৭৫		কে.এম. ওবায়দুর রহমান	আফগানিস্তানে পাটকল স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা, বিমান চলাচলের ব্যাপারে আলোচনা ও বিমান চলাচল চুক্তি স্বাক্ষর। ঢাকা-কাবুল কারিগরি সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর	The Bangladesh Times, 24 June, 1975 দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ ও ২৬ জুন, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

সন ও তারিখ	প্রতিনিধি (আগত)	প্রতিনিধি (গমনকারী)	আলোচ্য বিষয়/চুক্তি	পত্রিকা ও তারিখ
১৯৭৫		বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী ফেরদৌসী রহমান ও বেদারউদ্দিনসহ ছয়জন সঙ্গীতশিল্পী	আফগানিস্তানের তৃতীয় প্রজাতান্ত্রিক দিবস উপলক্ষ্যে কাবুলের নান্দারি হল ও গাজী স্টেডিয়ামে সঙ্গীত পরিবেশন	The Bangladesh Times, 3 March, 1976.
২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭	আফগান মন্ত্রী হামিদুল্লাহ টারজী		বৈদ্যুতিক সামগ্রী এবং নিউজপ্রিন্ট ক্রয় করার ব্যাপারে আলোচনা ও বাণিজ্য প্রটোকল স্বাক্ষর	দৈনিক বার্তা, ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭ দৈনিক সংবাদ, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭
ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭	বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের প্রধান গুলাম হোসেন		বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর	দৈনিক সংবাদ ১ মার্চ, ১৯৭৭
মার্চ, ১৯৭৭		বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সি. এম. মোর্শেদ	আফগানিস্তানে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন, বাংলাদেশের পক্ষে রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিজের পরিচয়পত্র প্রদান করেন	The Bangladesh Times, 8 March, 1977 The Bangladesh Observer, 8 March, 1977
১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮	আফগানিস্তানের শিল্প ও খনিজ মন্ত্রী আব্দুল তোয়াব আশেকী ও তাঁর স্ত্রী		শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি লক্ষ্য করা এবং এ লক্ষ্যে দর্শনা চিনিকল, চিটাগাং স্টিল মিলস ও কর্ণফুলি পেপার মিল পরিদর্শন	দৈনিক বাংলা, ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮ The Bangladesh Times, 16 February, 1978

উৎসঃ বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা যেমনঃ *দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বাংলা, দৈনিক আজাদ, দৈনিক বাংলার বাণী, দৈনিক সংগ্রাম, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলা, দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক বার্তা, The Banglades Times, The Bangladesh Observer, The Morning News.*

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৮

আফগানিস্তান হতে আমদানিকৃত পণ্যের তালিকা

অর্থ বছর	পণ্যের নাম	উৎস	পৃষ্ঠা নম্বর
১৯৭৩-৭৪	বিভিন্ন প্রকার ফল এবং শাক সবজি	Annual Import payments (1973-74), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	41
১৯৭৬-৭৭	পাকানো সুতা, তৈরি পোশাক এবং সুতা ও কাপড়ে তৈরি বিভিন্ন প্রকার প্রয়োজনীয় ও সৌখিন দ্রব্য	Annual Import payments (1976-77), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	34
১৯৭৭-৭৮	বিভিন্ন প্রকার ফল এবং শাকসবজি	Annual Import payments (1977-78), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	44
১৯৮১-৮২	পাকানো ও বুনা সুতা, তৈরি পোশাক ও পোশাকজাত দ্রব্য	Annual Import payments (1981-82), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	41
১৯৮২-৮৩	দুগ্ধজাত দ্রব্য ও ডিম	Annual Import payments (1982-83), statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	40
১৯৮৩-৮৪	বিভিন্ন প্রকার ফল, শাকসবজি, চিকিৎসা সরঞ্জাম, এবং ঔষধপত্র, প্লাস্টিক দ্রব্য, রাবার গুনা এবং পাকানো সুতা তৈরী পোষাক, লৌহ ও স্টিলের তৈরি পণ্য, যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও উদ্ভিজ্জ তন্তু ইত্যাদি	Annul Import payments (1983-84), statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	48-49

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ১৯

বাংলাদেশ হতে আফগানিস্তানে রপ্তানিকৃত পণ্যের তালিকা

অর্থ বছর	পণ্যের নাম	উৎস	পৃষ্ঠা নম্বর
১৯৭৪	পাকানো সুতা ও সুতার তৈরি দ্রব্য	Monthly Export Receipt, March, 1974, Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	15
১৯৭৫	পাট দ্বারা তৈরি চট ও থলে, পাটের সুতা ও দড়ি, কাঁচাপাট চা-পাতা	Monthly Export Receipt, December, 1975, Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	21
১৯৭৬-৭৭	চা, রেয়ন, পাট হতে প্রস্তুত চট ও থলে প্রভৃতি	Annual Export Receipt, (1976-77), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	77
১৯৭৭-৭৮	চা, কাঁচাপাট, পাট হতে প্রস্তুত চট ও থলে প্রভৃতি	Annual Export Receipts, (1977-78), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	35
১৯৭৮-৭৯	চা, কাঁচাপাট,ঔষধ, কাপড়ের ব্যাগ, চট ও পাটের ব্যাগ	Annual Export Receipts, (1978-79), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	32
১৯৭৯-৮০	চা, চট ও পাটের ব্যাগ প্লাস্টিক সামগ্রী ইত্যাদি	Annual Export Receipts, (1979-80), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	35
১৯৮০-৮১	চা, পাটের ব্যাগ ও চট, পাটের রশি ইত্যাদি	Annual Export Receipts, (1980-81), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	39
১৯৮১-৮২	চা, শুকনা ও সংরক্ষিত শাকসবজি, চট ও পাটের থলে, পাটের রশি	Annual Export Receipts, (1981-82), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	35
১৯৮২-৮৩	চা, পাটের ব্যাগ, চট, পাটের রশি ইত্যাদি	Annual Export Receipts, (1982-83), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	38
১৯৮৩-৮৪	চিনি, মধু, মোম, কফি, চা, মসলা, সুতা, পাটজাত কাপড়, পাটের তৈরি ব্যাগ ও চট, পাটের রশি	Annual Export Receipts, (1983-84), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	53
১৯৮৫-৮৬	চা, কফি ও বিভিন্ন প্রকার মসলা	Annual Export Receipts, (1985-86), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	46
১৯৮৬-৮৭	হিমায়িত মৎস, কফি, চা, মসলা, ফলে প্রস্তুত কাপড়, সুতা, পাটের রশি, চট ও চটের ব্যাগ ইত্যাদি	Annual Export Receipts, (1986-87), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	53
১৯৮৭-৮৮	সুতা, কাপড়, চট বস্ত্র, পাটের রশি, পাটের তৈরি কার্পেট, বিভিন্ন প্রকার শুকনা হাড় প্রভৃতি	Annual Export Receipts, (1987-88), Statistics Dept. Bangladesh Bank, Dhaka	55-56
১৯৮৮-৮৯	চা, কফি, মসলা, সবুজ চা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, সুতা, সুতায় বোনা কাপড়, চট, পাটজাত বস্ত্র, পাটের রশি প্রভৃতি	বার্ষিক রপ্তানি আয় (১৯৮৮-৮৯) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা	71-72
১৯৮৯-৯০	চা, কফি, মসলা, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, শাকসবজি, সুতা, কাপড়, রশি, পাটের তৈরি কার্পেট প্রভৃতি	বার্ষিক রপ্তানি আয় (১৯৮৯-৯০) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা	66
১৯৯০-৯১	কফি, চা, মসলা, চামড়াজাত পণ্য, চামড়া, শাকসবজি, কাগজ ও কাগজের মণ্ড ইত্যাদি	বার্ষিক রপ্তানি আয় (১৯৯০-৯১) পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা	203

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২০

১৯৭৩-১৯৯০ পর্যন্ত আফগানিস্তান থেকে বাংলাদেশে আমদানিকৃত পণ্যের অর্থের হিসাব

অর্থবছর	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)
১৯৭৩-৭৪	---
১৯৭৪-৭৫	---
১৯৭৫-৭৬	---
১৯৭৬-৭৭	১৪৯
১৯৭৭-৭৮	---
১৯৭৮-৭৯	---
১৯৭৯-৮০	---
১৯৮০-৮১	---
১৯৮১-৮২	২
১৯৮২-৮৩	১
১৯৮৩-৮৪	১১৯
১৯৮৪-৮৫	---
১৯৮৫-৮৬	---
১৯৮৬-৮৭	---
১৯৮৭-৮৮	---
১৯৮৮-৮৯	---
১৯৮৯-৯০	---
১৯৯০-৯১	---

Source: *Annual Import Payments* 1987-88, p. 130-131, 136 and 1990-91, p. 352 Statistics Department, Bangladesh Bank, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ২১

১৯৭২-৭৩ অর্থবছর হতে ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ হতে আফগানিস্তানে রপ্তানি পণ্যের হিসাব

অর্থবছর	টাকার পরিমাণ (হাজারে)
১৯৭২-৭৩	৪.১৯
১৯৭৩-৭৪	১৪.৯০
১৯৭৪-৭৫	২৮.৩৯
১৯৭৫-৭৬	১০২০১
১৯৭৬-৭৭	১০৩০০
১৯৭৭-৭৮	২৫২৬৪
১৯৭৮-৭৯	১০৫৭০
১৯৭৯-৮০	১৬৯৮৮
১৯৮০-৮১	২৮৫৬০
১৯৮১-৮২	১২৯০৮
১৯৮২-৮৩	৩৭৭০০
১৯৮৩-৮৪	১২৯০২৯
১৯৮৪-৮৫	১৫২৮৬
১৯৮৫-৮৬	৫৫৯৯০
১৯৮৬-৮৭	২৯৬৭৪
১৯৮৭-৮৮	৩২৫৯৫
১৯৮৮-৮৯	১৮১৬৯
১৯৮৯-৯০	৯৬২৩
১৯৯০-৯১	২৩৬৭৬

Source: *Annual Export Receipts* 1978-79, p. 91, 1980-81, p. 127, 1987-88, p. 270, 1989-90, p. 242 and 1990-91, p. 346, Statistics Department, Bangladesh Bank, Dhaka

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

ইংরেজি বই

Abbas, Zainab Ghulam, *Story of Pakistan* (Karachi: Pakistan Publication, 1964)

Ahmed, Emajuddin, *Foreign Policy of Bangladesh* (Dhaka: Dhaka University Press, 1984)

Ahmed, Emajuddin and Kalam Abul (ed.), *Bangladesh, South Asia and the World* (Dhaka: Academic Publishers, 1992)

Ahmed, Fakhruddin, *Critical Times, Memories of a South Asian Diplomat,* (Dhaka: UPL, 1994)

Ahmed, Noor Baba, *Organization of Islamic Conference Theory and Practice of Pan-Islamic Co-operation,* (Dhaka: UPL, 1994)

Ahmed, Saiyid M., *The Federation of Pakistan* (Karachi: Educational Book Dept. 1950)

Ahmed, Mushtaq, *Pakistan Foreign Policy* (Karachi: Space Publishers, 1968)

Ahmed, Muzaffer and Kalam, Abul (ed.), *Bangladesh Foreign Relation* (Dhaka: Dhaka University Press, 1989)

Ahmed, Muneer, *The Civil Servant in Pakistan* (Karachi: Oxford University Press, 1964)

Ahmed, Akbar, *Relation and Politics in Muslim Society: Order and Conflict in Pakistan* (London: Cambridge University Press, 1983)

Ahmed, Kamruddin, *A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh* (Dhaka: Bangladesh: Inside Library, 1975)

Ahmed, Rafiquddin (ed.), *Islam in Bangladesh: Society, Culture and Politics* (Dhaka: Bangladesh Itihash Samiti, 1983)

Alam, Jaglul, *Emergence of Bangladesh and Big Power Role in 1971* (Dhaka: Progoti Prokashoni, 1990)

Allworth, Edward (ed.), *Central Asia: A Century of Russian Rule* (New York: Columbia University Press, 1967)

Alan, Gledhill, *Pakistan* (London: Stevens, 1957)

Andrew, W. P., *India and her Neighbours* (London: Wn. H – Allen & Com, 1878)

Anwar, Moazzam, *Jamal-al-din-al-Afghani* (New Delhi: Concept Publication, 1984)

Aspaturian, Vernor, *Process and Power in the Soviet Foreign Policy* (Boston: Little Brown and Company, 1971)

Ayoob, Mahoammed, *India, Pakistan & Bangladesh* (New Delhi: India Council of World Affairs, 1975)

Dhaka University Institutional Repository

Ayoob, Mohammed, *Liberation War* (New Delhi: S. Cand & Co., 1972)

Aziz, K. K., *Making of Pakistan* (London: Chatto and Windus, 1967)

Afghanistan Constitution, *Constitution of the Republic of Afghanistan* (Kabul: Education Press, 1977)

Bach, Quintin, *Soviet Economic Assistance to Less Development Countries: A Statistical Analysis* (Oxford: Clarendon Press, 1987)

Banarjee, Jyotirmoy, *India in Sovit Global Strategy* (Calcutta, South Asian Books, 1977)

Banu, Razia Akhter U.A.B, *Islam in Bangladesh* (New York: Koln, Netherlands: F.J. Brill, 1992)

Bains, J.S., *India's International Disputes* (London: Asia Publishing Home)

Banarjee, Anil Chandra, *Constitutional History of India, 1919-1977* (Delhi: Macmillan, 1978)

Becker, Abraham, *The Soviet Union and the Third World: The Economic Dimension* (Washington D.C.: Rand Corporation, 1986)

Beard, Charles, A, *The Idea of National Interest: An Analytical Study of American Foreign Policy* (New York: Macmillan, 1934)

Bellew, H. W., *Afghanistan and the Afghans* (Delhi: Shree Publishing Home, 1979)

Beloft, Nou, *Foreign Policy of Soviet Russia* (London: Oxford University Press, 1952)

Bennigsen, Alexander & Broxupm, *Islamic Threat to the Soviet State* (London: Croom Helm, 1983)

Bhargava, G. S., *Pakistan in Crisis* (Delhi: Vikas, 1971)

Bhutto, Zulfikar Ali, *The Great Tragedy,* (Karachi: Pakistan People's Party Publication, 1971)

Bradshaw, Henrys, *Afghanistan and the Soviet Union,* (Dhaka: Dhaka University Press, 1985)

Brownlie, Ianedy, *Basic Documents in* Interantional (Oxoford: Elovendon Press, 1972)

Brelvi, Mahmud, *Muslim Neighbours of Pakistan* (Lahore: Ripon Press, 1950)

Bukshi, S. R. (ed.), *The Making of India and Pakistan* (New Delhi: Deep & Deep Publication, 1997)

Burke, S. M., *Pakistan's Foreign Policy* (London: Oxford University Press, 1973)

Bhargava, G. S., *South Asian Security After Afghanistan* (Toronto: Lexington Books, 1983)

Bhattacharjee, G. P., *Renaissance and Freedom Movement in Bangladesh* (Calcutta: The Minava Associates, 1973)

Brzezinski, Z, *The Soviet Politics: From Future to the Past* (New York: Columbia University Press, 1975)

Dhaka University Institutional Repository

Canen, Robert (ed.), *Soviet Interests in the Third World* (London: New Delhi: Sage Publications, Royal Institute of International Affairs, 1985)

Chakravarti, S. K., *The Evolution of Politics in Bangladesh, 1947-78* (New Delhi: Associated Publishing 1978)

Chakravarty, S. K., *Foreign Policy of Bangladesh* (Delhi: Han–Anand Publication, 1994)

Choudhury, G. W., *India, Pakistan, Bangladesh and the Major Powers* -(London: Macmillan Publishers, 1975)

Chaudhury, Mohammad Ahsan, *Pakistan and Great Power* (Karachi: Council for Pakistan Studies, 1970)

Chopra, Pran, *Before and After the Indo-Soviet Treaty* (New Delhi, India: S. Chand and Co. Pvt. Limited, 1972.

Chailand, Gerard, Taman Jackoby, *Report from Afghanistan* (New York: Viking Press, 1981)

Chakravarty, B. N., *India Speaks to America,* (Bombay: Orient Longman, 1960)

Chandra, Bipan, *Communalism in Modern India* (New Delhi: Vikas Publishing, 1985)

Donaldson, R. (ed.), *The Soviet Union in the Third World: Success of Failures* (New York: West view Press, 1980)

Donnell, Charles P., *Bangladesh: Biography of a Muslim Nation* (London: West view Press, 1984)

Duncan, Peter, J.S., *The Soviet Union and India* (London: The Royal Institute of International Affairs, 1989)

Duncan, Raymond (ed.), *Soviet Policy in the Developing Countries* (New York: Robert E. Kriegen Publishing Company, 1981)

Duncan Raymond and Carolyn Mc Giffert Khedahl (ed.), *Moscow and the Third World Under Gorbachev* (Colorado: Westview Press, 1990)

Dani, Ahmad Hasan, *Peshawar: Historic City of the Frontier* (Peshawar, Zahaullak, 1969)

Department of Films & Publication Govt. of Pakistan, *Indo Pakistan War a Flashback* (Lahore: ISPR Pub., 1960)

Dutt, V.P., *Indian's Foreign Policy* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1992)

Dhar, Asha, *Folk tales of Afghanistan* (New Delhi: Stealing Pub. 1992)

Dodwell, H. H., *The Cambridge History of India* (London: Cambridge University Press, 1929)

Elliot, Sir H.M., *Afghan dynasties* (Calcutta: Susil Gupta, 1955)

Elliott, J. G. (Major General), *The Frontier (1839-1947)* (London: Oxford University Press, 1988)

Dhaka University Institutional Repository

Edmonds, Robin, *Soviet Foreign Policy: The Brezhnev Years* (London: Oxford University Press, 1983)

Furnin, Edgars and Snyder Richard C., *An Introduction to American Foreign Policy* (New York: Rinehat, 1955)

Fraser–Tatler, W. K, *Afghanistan* (London: Oxford University Press, 1964)

Fletcher, Arnold, *Afghanistan,* (New York: Cornell University Press, 1961)

Feldman, Herbert, *Pakistan,* (Lahore: Oxford University Press, 1981)

Fenchtwanger, E. J., and Nailon, Petor (ed.), *The Soviet Union and the Third World* (London: Macmillan, 1981)

Gifford, Prosser (ed.), *The National Interest of the United States* (Washington, D.C.: Woodrow Wilson International Centre for Scholars, University Press of America, 1981)

Gilpin, Robert, *War and Change in World Politics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981)

Golan Galia, *The Soviet Union and National Liberation Movements in the Third World* (Boston: Urwin Hyman, 1989)

Griffith, W. (ed.), *The World and the Great Power Triangles* (Cambridge: Cambridge University Press, 1975)

Gupta, Bhabani Sen, *The Fulcrum of Asia: Relation Among China, India, Pakistan and the USSR,* (New York: Peganus, 1970)

Gupta, Bhabani Sen, *Communalism in Indian Politics* (New York: Columbia University Press, 1972)

Gupta, Bhabani Sen *Afghan Syndrome* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1982)

Gandhi, Indira, *Aspests of Our Foreign Policy* (New Delhi: V. N. Malhotra, 1973)

Gupta, D. C., *Indian Government snd Politics* (New Delhi: Vikas Publishing House, 1978)

Griffiths, John. C., *Afghanistan: Key to a Contiment* (Colorado: Westview Press, 1982)

Gopal Ram, *Ando-Pakistan War and Peace* (Luchnow: Pustak Kendra, 1965)

Geoffrey, Roberts, *The Soviet Union in World Politics- 1945-1999* (New York: Routledge, 1999)

Gankovshy, Y. U. V., *History of Afghanistan* (Moscow: Progress Publication, 1985)

Gupta, R. C., *US Policy Towards India and Pakistan* (Delhi: B. R. Publication, 1977)

Ghatate, W. M., *Bangladesh Crisis and Consequences* (New Delhi: New Delhi Research Institute, 1971)

Hammond, Thomas T., *Red Flag Over Afghanistan* (Boulder: West view Press, 1984)

Haq, Muhammad Shamsul, *Bangladesh in International Politics,* (Dhaka: Dhaka University Press, 1993)

Dhaka University Institutional Repository

Haq, Muhammad Shamsul, *International Politics: A Third World Perspective* (Dhaka: Academic Publications Ltd., 1987)

Hyman, Anthony, *Afghanistan Under Soviet Domination 1964-1983* (London: Macmillan Academic and Professional Printing, 1992)

Hasanat, Abdul, *Ugliest Genocide in History* (Dhaka: Muktadhara, 1974)

Hannan, Mohammed, *Liberation Struggle of Bangladesh* (New Delhi: Hakkani Publishers, 1999)

Hammond, T. T., *Red Star Over Afghanistan: The Communist Coup, The Soviet Invasion and Their Consequences,* (London: West view Press, 1982)

Hassan, Shawkat, *India-Bangladesh Political Relation During the Awami League Government, 1972-75* (Michigan: UM Dissertation Information Service, 1988)

Hurn, Robert, *Soviet-Indian Relations: Issues and Influence* (New York: Praeger, 1982)

Habibullah, A. B. M., *The Foundation of Muslim Rule in India* (Allahabad: Vanguard Press, 1961)

Imam, Zafar, *Colonialism in East-West Relations: A Study of Soviet Policy Towards India and Anglo-Soviet Relations, 1917-1947,* (New Delhi: Eastman Publication, 1969)

Imam, Zafar, *Towards a Model Relationship: a Study of Soviet Treaties with India and Other Third World Countries* (New Delhi: ABC Publishing House, 1983)

Islam, Nurul, *Development Strategy of Bangladesh* (Oxford: Pergamon Ltd., 1978)

Islam, Rafiqul, *Bangladesh Liberation Movement* (Dhaka: Dhaka University Press Ltd., 1987)

Joshi, Rita, *The Afgan Nobility and Mughals (Afghans)- 1526-1707* (New Delhi: Vikas Publishing Home, 1985)

Jain, J. P., *Soviet Policy Towards Pakistan and Bangladesh* (New Delhi: Radiant Publishing, 1985)

John, Anthony and Daviet E. Powell (ed.), *Soviet Update 1989-1996* (Oxford: West view Press, 1991)

Jackson, Robert, *South Asian Crisis: India, Pakistan and Bangladesh* (New York: Praeger, 1975)

Jukes, Geoffrey, *The Soviet Union in Asia* (Berkeley C.A: Berkeley University of California Press, 1973)

Khan, M. Asghar, *First Round and Pakistan War 1965* (New Delhi: Vikas Publishing Home, 1979)

Kolodziej, E. A, and Kanet, R (ed.), *Developing Countries, Foreign Relation with Soviet Union* (London: Macmillan, 1989)

Khan, Safia, *Afghan Caravan* (London: Octagon Press, 1990)

Kamali, Mohammad Hashim, *Law in Afghanistan* (Leiden: Brill, 1985)

Dhaka University Institutional Repository

Khair, Md. Abul, *United States Foreign Policy in the Indo-Pakistan Subcontinent (1939-1947)* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1968)

Konishi, Masatashi, *Afghanistan* (London: Word lock and Co. Ltd., 1969)

Kabir, M. G. and Hasan, Shawkat (ed.), *Issues and Challenges Facing Bangladesh Foreign Policy* (Dhaka: Bangladesh Society of International Studies, 1989)

Kanet, Roger E. and Donna Bahry (ed.), *Soviet Economic and Political Relations with the Developing World* (New York: Praeger, 1975)

Kaplan, Stephen (ed.), *Diplomacy of Power: Soviet Armed Forces as a Political Instrument* (Washington, D.C.: The Brookings Institute, 1981)

Kapur, K. D., *Soviet Strategy in South Asia: Perspectives on Soviet Policies Towards the Indian Subcontinent and Afghanistan* (New Delhi: Young Asia Publications, 1983)

Katz, Mark, *Third World in Soviet Military Thought* (Baltimore, M.D: The John Hopkins University Press, 1982)

Kaushik, Devendra, *Soviet Relation with India and Pakistan* (London: Vikas Publications, 1971)

Kissinger, Henry A., *American Foreign Policy* (New York: W. W. Norton and Company Inc., 1974)

Kurian, George Thomas, *Encyclopedia of the Third world*, Vol. 1 (London: Mansell Publishing Limited, 1982)

Mostofa, Golam, *National Interest and Foreign Policy: Bangladesh Relations with Soviet Union and Its Successor States* (Dhaka: The University Press Limited, 1995)

Momen, Nurul, *Bangladesh in the United Nation*, (Dhaka: UPL, 1987)

Padelford, Norman S. and George A. Lincoin, *The Dynamies of International Politics* (New York: The Macmillan, 1962)

Prasad, Ishwari, *A Short History of Muslim Rule in India* (Allahabad: The University of Allahabad, 1939)

Sarkar, Sir Jadu-Nath (ed.), *The History of Bengal (Muslim Period),* (New Delhi: Academica Asiatica Patna)

Sharma, Sarbijit, *US Bangladesh Relation* (Dhaka: University Press Limited, 2001)

Trivedi, Rabindranath, *International Relations of Bangladesh and Bongobandhu Sheikh Mujibur Rahman*, Vol. II, (Dhaka: Parma, 1999)

Wright, Denis, *Bangladesh Origien and Indian Ocean Relation* (Dhaka: Academic Publications, 1988)

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বই

আব্দুর রসিদ চৌধুরী, *বন্দী শিবিরে নয় মাস* (ঢাকা: এ.কে.এস. ছাদেক কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৭৩)

আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী ঃ বাংলাদেশ ঃ ১৯৭১* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৭)

আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

আব্দুল করিম, *ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসন* (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ২০০১)

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (অনূ. ও সম্পা.), *তবকাত-ই-নাসিরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)

আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯০)

আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর* (ঢাকা: নওরোজ কিতাব মহল, ১৯৯৫)

আল মাহমুদ ও আফজাল চৌধুরী (সম্পা.), *আফগানিস্তান আমার ভালবাসা* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৩)

আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২)

এ বি এম হাবিবুল্লাহ, *ভারতের মুসলিম শাসনের বুনিয়াদ*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৪)

এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫)

এম. আর. আখতার মুকুল, *চরমপত্র* (ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ২০০০)

এম. এম. বিপাশ আনোয়ার, *জিয়াউর রহমানের নির্বাচিত ভাষণ* (ঢাকা: ধরণী সাহিত্য সংসদ, ২০০২)

কাশীরাম দাস (অনূ.), *মহাভারত* (কলিকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরী, ১৩৯৩ বাংলা)

কাজী জাহেদ ইকবাল, *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি (১৯৭১-২০০১)* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০২)

খাজা নিজামউদ্দীন আহমদ, *তবাকাত-ই-আকবরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৮)

গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, ১৯৬৫)

গোপাল হালদার, *বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা* (কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, বাংলা ১৪০৪)

গোলাম সামদানী কোরায়শী (অনূ.), *তারিখ-ই-ফিরোজশাহী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক,১৯৭১-১৯৮১*, (অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস), ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী, *মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলা* (ঢাকা: অধুনা প্রকাশন, ২০০৬)

ডক্টর এম.এ. রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮২)

তেসলিম চৌধুরী, *মধ্যযুগের ভারত (সুলতানি আমল)* (কলিকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৬)

নূর হাসনা লতিফ, *পাকিস্তানে আটক দিনগুলি* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯০)

প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ (অনূ.), *বাবুরনামা (দ্বিতীয় খণ্ড)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)

ফখরুদ্দিন আহমেদ, *উত্তাল তরঙ্গের দিনগুলি, এক দক্ষিণ এশিয় কূটনীতিকের স্মৃতিকথা* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০১)

Dhaka University Institutional Repository

মেজর জেনারেল মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (অব.), *পূর্বাপর ১৯৭১ ঃ পাকিস্তানি সেনা-গহ্বর থেকে দেখা* (ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৫)

মোস্তফা কামাল, *আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংখ্যা, ২০০২)

মোহাম্মদ সোলায়মান, *পরাশক্তি ও আফগানিস্তান* (চট্টগ্রাম: জেওর প্রকাশনী, ১৯৮৬)

মোঃ আঃ গফুর সরকার, *পাকিস্তান শিবিরে* (ঢাকা: মিল্লাত লাইব্রেরী, ১৯৮৬)

মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১* (ঢাকা: ইউ.পি.এল, ১৯৯২)

মফিজুল ইসলাম, *হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের নয় বছর সংস্কার, উন্নয়ন ও অগ্রগতির নবযুগ* (ঢাকা: রওশন এরশাদ কর্তৃক প্রকাশিত, ২০০৬)

মীনহাজ-উস-সিরাজ, *তবাকাত-ই-নাসিরী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩)

মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, *বাঙলার খিলাফত অসহযোগ আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৬)

মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা* (ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ১৯৯৯)

মুহাম্মদ নূরুল কাদির, *একাত্তর আমার* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯)

মুহাম্মদ সানসউল হক, *বিশ্ব রাজনীতি ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: ঝিনুক প্রকাশনী, ২০০২)

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও শেখ মুজিব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮)

রফিকুল ইসলাম (বীরউত্তম), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে* (ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯৬)

রোমিলা থাপার, *ভারতবর্ষের ইতিহাস* (কলিকাতা: ওরিয়েন্ট লংম্যান প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮০)

লে. ক. (অব.) এম.এ. হামিদ, পিএসসি, *পাকিস্তান থেকে পলায়ন* (ঢাকা: মোহনা প্রকাশনী, ১৯৯১)

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ, দক্ষিণ এশিয়া ও সাম্প্রতিক বিশ্ব* (ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬)

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকা: ভানা প্রকাশনী, ১৯৮২)

সৈয়দ নাজমুদ্দীন হাশেম, *বন্দীশালা পাকিস্তান* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৫)

সৈয়দ মুজতবা আলী, *দেশে বিদেশে* (ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলা ১৪১০)

শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (কলিকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৮৭)

শামসুর রহমান, *বন্দী শিবির থেকে* (চট্টগ্রাম: বইঘর, ১৯৯৭)

সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাস (১২০৪-১৫৭৬)*, (ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোম্পানী, ২০০০)

সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (১ম খণ্ড)*, (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৩)

সুমন চট্টোপাধ্যায় (অনু.), *প্রাচীন ভারত* (কলিকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪)

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, *সাংস্কৃতিকী* (কলিকাতা: বাক সাহিত্য, বাংলা ১৩৭২)

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র* (ঢাকা: বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধ ইতিহাস লিখন ও মুদ্রণ প্রকল্প (তথ্য মন্ত্রণালয়), ১৯৮৪

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি জার্ণাল

Annual Import Payment, 1976-77, 1977-78, Statistics Department, Bangladesh Bank,

Facts on File, Vol. XXXII, No 1672, 12-18 November, 1972

Monthly Export Receipt, March 1974, December 1975, Statistics Department (Dhaka: Bangladesh Bank)

The Pakistan Institute of International affairs, *Pakistan Horizon,* , Vol. XXVI, No- 1, first Quarter, (Karachi: 1973)

পত্র-পত্রিকা : ইংরেজি

India News, (London), 29 May, 1971

India News, (London), 4 September, 1971

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 2 March, 1973

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 10 April, 1973

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 20 May, 1973

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 19 June, 1973

The Daily Dawn, (Karachi), 14 April, 1973

The Bangladesh Times, (Dhaka), 30 June, 1974

The Bangladesh Times, (Dhaka), 15 March, 1974

The Morning News, (Dhaka), 1 July, 1974

The Morning News, (Dhaka), 15 March, 1975

The Bangladesh Times, (Dhaka), 17 July, 1975

The Bangladesh Times, (Dhaka), 24 June, 1975

The Bangladesh Times, (Dhaka), 28 June, 1975

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 16 March, 1975

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 28 June, 1975

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 7 May, 1976

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 17 July, 1976

The Bangladesh Times, (Dhaka), 7 May, 1976

The Bangladesh Times, (Dhaka), 17 July, 1976

The Bangladesh Times, (Dhaka), 3 March, 1976

The Bangladesh Times, (Dhaka), 8 March, 1977

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 8 March, 1977

Dhaka University Institutional Repository

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 16 February, 1978

The Bangladesh Times, (Dhaka), 16 February, 1978

The Bangladesh Times, (Dhaka), 29 March, 1979

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 15 March, 1982

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 25 March, 1982

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 19 June, 1983

The Bangladesh Times, (Dhaka), 10 August, 1983

The Bangladesh Observer, (Dhaka), 16 November, 1984

The Bangladesh Times, (Dhaka), 28 November, 1984

The New Nation, (Dhaka), 16 March, 1984

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা প্রবন্ধ

এ.কে.এম. শাহনাওয়াজ, "সুলতানী বাংলায় ধর্ম-চিন্তা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা", *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা, ২৫-২৫ সংখ্যা, ২০০২

কে.এম. মোহসীন, "উপমহাদেশে মুসলিম যুগে ইতিহাস লেখকদের লেখার রীতি ও বিষয়বস্তু ক্রমধারা এবং পরিবর্তন", *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, ঢাকা, ২৫-২৬ সংখ্যা, ২০০২

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশ ও ইসলামি বিশ্ব", *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১৯৮৪

পত্র-পত্রিকা : বাংলা

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১১ অক্টোবর, ১৯৭২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৩ নভেম্বর, ১৯৭২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৫ অক্টোবর, ১৯৭২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৩০ আগস্ট, ১৯৭২

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৩০ আগস্ট, ১৯৭২

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১১ এপ্রিল, ১৯৭৩

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১৯ মে, ১৯৭৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১০ এপ্রিল, ১৯৭৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১১ এপ্রিল, ১৯৭৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৯ মে, ১৯৭৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৫ আগস্ট, ১৯৭৩

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৩ মার্চ, ১৯৭৩

দৈনিক স্বদেশ, (ঢাকা), ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩

দৈনিক সমাজ, (ঢাকা), ২০ জানুয়ারি, ১৯৭৩

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১ জুলাই, ১৯৭৪

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২ জুলাই, ১৯৭৪

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৩০ জুন, ১৯৭৪

দৈনিক আজাদ, (ঢাকা), ২ জুলাই, ১৯৭৪

দৈনিক সমাজ, (ঢাকা), ৩ জুলাই, ১৯৭৪

দৈনিক পূর্বদেশ, (ঢাকা), ২ জুলাই, ১৯৭৪

দৈনিক বাংলার বাণী, (ঢাকা), ২ জুলাই, ১৯৭৪

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১১ মে, ১৯৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১৫ মার্চ, ১৯৭৫

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১৭ মে, ১৯৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১৭ জুলাই, ১৯৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৫ জুন, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৪ মে, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৪ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৮ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৭ মে, ১৯৭৫

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৫ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৫ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৬ জুন, ১৯৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৭ মে, ১৯৭৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৪ জুলাই, ১৯৭৫

দৈনিক পূর্বদেশ, (ঢাকা), ১১ মে, ১৯৭৫

দৈনিক পূর্বদেশ, (ঢাকা), ১৮ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক বাংলার বাণী, (ঢাকা), ১৮ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক আজাদ, (ঢাকা), ১৬ মার্চ, ১৯৭৫

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৬ জুলাই, ১৯৭৬

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ জুলাই, ১৯৭৬

দৈনিক আজাদ, (ঢাকা), ১ জুলাই, ১৯৭৬

দৈনিক সংগ্রাম, (ঢাকা), ২ মার্চ, ১৯৭৭

দৈনিক দেশবাংলা, (ঢাকা), ২ মার্চ, ১৯৭৭

দৈনিক বার্তা, (ঢাকা), ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৭

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২ মার্চ, ১৯৭৭

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৭

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৮ মার্চ, ১৯৭৭

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

দৈনিক আজাদ, (ঢাকা), ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ জুন, ১৯৮০

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২১ নভেম্বর, ১৯৮০

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৯ আগস্ট, ১৯৮০

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১৬ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৬ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৩ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৯ আগস্ট, ১৯৮০

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৮ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১১ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৩ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ২৩ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৩০ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৪ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৭ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৭ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৮ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৯ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক আজাদ, (ঢাকা), ৭ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক আজাদ, (ঢাকা), ৯ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংগ্রাম, (ঢাকা), ১১ জানুয়ারি, ১৯৮০

দৈনিক সংগ্রাম, (ঢাকা), ৪ জানুয়ারি, ১৯৮০

সাপ্তাহিক একতা, (ঢাকা), ৪ ডিসেম্বর, ১৯৮১

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৫ মার্চ, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২০ অক্টোবর, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২০ জুলাই, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৩ আগস্ট, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৭ আগস্ট, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৮ মে, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৯ আগস্ট, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৯ নভেম্বর, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৮ মে, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৫ মে, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৫ জুলাই, ১৯৮২

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৯ অক্টোবর, ১৯৮২

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১৯ জুলাই, ১৯৮২

দৈনিক সংগ্রাম, (ঢাকা), ১ ডিসেম্বর, ১৯৮২

দৈনিক স্বদেশ, (ঢাকা), ১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৬ নভেম্বর, ১৯৮৩

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১০ মার্চ, ১৯৮৩

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ১২ মার্চ, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১০ আগস্ট, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১২ আগস্ট, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৪ মার্চ, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৭ মার্চ, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৯ মার্চ, ১৯৮৩

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৩

সাপ্তাহিক রোববার, (ঢাকা), ডিসেম্বর, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৮ অক্টোবর, ১৯৮৪

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৪ নভেম্বর, ১৯৮৪

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ নভেম্বর, ১৯৮৪

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৬ নভেম্বর, ১৯৮৪

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

সাপ্তাহিক একতা, (ঢাকা), ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৪

সাপ্তাহিক একতা, (ঢাকা), ৩০ নভেম্বর, ১৯৮৪

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ১১ আগস্ট, ১৯৮৫

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৬

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

দৈনিক ইত্তেফাক, (ঢাকা), ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৮৬

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ২৬ অক্টোবর, ১৯৮৬

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১১ নভেম্বর, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১২ নভেম্বর, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৯ আগস্ট, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৬ জানুয়ারি, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৮ অক্টোবর, ১৯৮৭

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৬ নভেম্বর, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৮ জানুয়ারি, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৯ জানুয়ারি, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১০ এপ্রিল, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ এপ্রিল, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৭ এপ্রিল, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ২৭ মার্চ, ১৯৮৮

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯

দৈনিক বাংলা, (ঢাকা), ৮ জানুয়ারি, ১৯৮৯

দৈনিক সংবাদ, (ঢাকা), ৩ জানুয়ারি, ১৯৮৯

সাপ্তাহিক একতা, (ঢাকা), ২০ এপ্রিল, ১৯৮৯

সাপ্তাহিক একতা, (ঢাকা), ২১ এপ্রিল, ১৯৮৯